সমুদ্র

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
প্রাপ্তিস্থান : কলিকাতা

মান্যবর

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

করকমলেষু :—

১৭-৩-৪১

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রার সহিত যা বর্তমান—সেই সমুদ্রের মুদ্রন-ব্যাপার থেকে সুরু করে' নানা দিক দিয়ে যিনি আমাকে অত্যন্ত সাহায্য করেছেন সেই অনির্বাণ সাহিত্যিক-বন্ধু শ্রীযুক্ত জীবানন্দ ঘোষকে সর্বপ্রথমেই আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্চি। এবং এই প্রসংগে যাঁদের শুভেচ্ছা আমাকে প্রতিনিয়ত প্রেরণা জুগিয়েছে সেই জনপ্রিয় সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নবশক্তি-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অদ্বৈত মল্ল বর্মন, আজাদ-সম্পাদক মিঃ আবুল কালাম শামসুদ্দীন, প্রবর্তকের শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত ও গল্প-লহরীর শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়গণের নিকটও আমার কৃতজ্ঞতা জানালাম।

লেখক

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায় -

লেখক

মরা মানুষের হাত

রাত্রি দুটোর সময় নীরেন বাড়ীতে ফিরলো। হাত-পা তার টল্ছে। বোধ হয় সামনে বিছানা পেলেই সে শুয়ে পড়ে, এমনি অবস্থা। না শান্তি নেই, পৃথিবীতে আর একটুও সুখ নেই। পয়সা দিয়ে যদি সুখ পাওয়া যেতো তবে রাজারাজড়ারা বড় বড় সুখী হত! কিন্তু হয় কী? সারা দিনটা সে বৃথা খোয়ালো; যাকে বলে স্রেফ সময়গুলোকে হত্যা করা।

বড় পার্টিতেও সে গেল, পয়সা দিয়ে জুয়াও খেললো, খেলে দারুণ মদ কিন্তু সুখ এল' না; এল তার অশান্তি। বোধ হয় মনে হচ্ছে শরীরের সমস্ত হাড়-পাঁজরাগুলো ভেতরে ভেতরে ভেংগে গেছে, যেন কিছুতে শৃংখলা নেই, নেই আরাম। মা থাকতে আর কিছু হত' বা না হত' তবু সে এতদূর অধঃপাতে যায় নি। কিন্তু মা মারা যাওয়ায় আজ আর তার মাথার উপর কেউ নেই। শুধু আছে আকাশ আর রাত্রির পেঁচার ডাক। কী সুখের পিছনে না সে ঘুরেছে? কিন্তু লাভ হয়েছে কী? শুধু অবসাদ আর বেদনা! বেদনা আর বিরক্তি! এতবড় বাড়ীতে দুটো চাকর আর সে ছাড়া কেউ থাকে না! কী আশ্চর্য! এই নিঃসংগতার মধ্যে মানুষ বাস করবে কেমন করে'? নিঃশ্বাস যে রুদ্ধ হয়ে আস্তে থাকে!

নীরেন নিজেকে সামলে নিয়ে সিঁড়ি ধরে' ফেল্লো। অন্ধকার গম্ গম্ কচ্ছে···নিস্তব্ধ অন্ধকার। একটা জন-মানব পর্যন্ত তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য বসে নেই। একজনও তার অপেক্ষা কর্ছে না। যে দুজন বৃদ্ধ চাকর আছে তার মার মৃত্যুর পর থেকে তাদের নীরেনই বলে রেখেছে যেন তারা না অপেক্ষা করে। কাজেই এখন তাদের গাঢ় নিদ্রা। নীরেন আন্দাজে আন্দাজে সুইজ ছুঁলো, তারপরই জেলে দিলো

আলো। আর দেরী নয়। যে ঘরে মা মারা গেছেন, সে ঘরটা এক নিঃশ্বাসে পার হয়ে এসে নীরেন নিজের শোবার ঘরে ঢুকে পড়লো। তার ঠাণ্ডায় তখনও শরীর কাঁপছে আর কাঁপবেই তো! রাত্রের শেষ দিকের এমন একটা মন্ত্রপূত শীতল আবহাওয়া আছে যেটা সত্যিই মনে গিয়ে কেমন একটা অনুভূতি জাগায়।

ঘরে গিয়েও নীরেন আলো জ্বাললো, কিন্তু মনে হল' তার যেন শীত লাগছে। নিশ্চয় পশ্চিম দিকের জানালাগুলো হাঁ করে খোলা আছে। হ্যাঁ তাই। নীরেন গ্রাহ্য করলো না। জামা কাপড় ছাড়লো। আব এই মুহূর্তে ঘরের স্তব্ধতাকে সে পছন্দ করে' ফেল্‌লো। সারা দিনের অনেক ভীড়ে সে মিশেছে; ঠিক এই অবসরে আর একজনেরও ভীড় সে সহ্য করতে পারবে না। মনে মনে সে স্বস্তি আন্‌বার চেষ্টা করলো। দেখলে সব ঠিক আছে। ঘরের টেবিল-চেয়ার-শোফা যেখানে যেমনটী ছিল ঠিক তেমনিই আছে। বড় আয়নার পানে চাইলো, কিন্তু তার প্রতিচ্ছবি আর ভালো লাগলো না।

হঠাৎ বিরক্তির সংগে ফিরতে যাবে কী বিছানার দিকে চেয়েই তার মূর্তি নীল হয়ে গেল।

সামনের ধবধবে চাদরের উপর পড়ে আছে একটা মানুষের হাত। আংউলগুলো ছড়ানো কিন্তু কিঞ্চিৎ মোড়া। একবার মনে হ'ল যেন অর্ধেক হাতটা সদ্য কেটে রাখা হয়েছে আর রক্তও লেগে আছে টাটকা। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে এ হাতটী কয়েকঘণ্টা আগের জীবিত একটী লোকের। ব্যাপার কী? একটা নিরপরাধ লোকের বিছানায় এটা কী করে এল? আর তো কোনো কিছুর চিহ্ন নেই। ঘরে এমন কোনোই বিশৃংখলা দেখা যাচ্ছে না যেখানে এটা হওয়া সম্ভব!

নিশ্চয় নীরেন স্বপ্ন দেখছে না তো? না, না। জিনিষটা এত কাছে পড়ে' আছে যে এই মুহূর্তেই নীরেন সেটাকে তার পা দিয়ে নেড়ে দিতে পারে। কে রেখে গেলরে বাবা? এমন কোনো বন্ধু কী ঠাট্টা করবার মৎলব এঁটেছে না কী? না! হাতটা মোমের বা অন্য কোনো ধাতু-টাতুর?

একমিনিটের জন্য সে ভাবলো, তারপরই নিশ্চিত হওয়ার জন্য সেটাকে পা দিয়ে ধাক্কা দিলো। কিন্তু আশ্চর্য! সেটা মানুষেরই; কারণ তেমনি নরম আর রক্তমাংসের জিনিষ। এবিষয়ে কোনো ভুল নেই যে এটার কর্তা কিছু আগে বেঁচে ছিলেন। নীরেন কেঁপে উঠলো।

কিছু চিন্তার পর নীরেন সাহস পেল হাতটার আরো কাছে এগিয়ে যাবার। তারপর ঘরটার চতুর্দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে। সে চাইলো বিছানার দিকে, তারপর পর্দা খোলা একটা জানালার ধারে, তারপর নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে' মনোযোগী ছাত্রের মতো কান খাড়া করে' রইলো। খোলা জানালা দিয়ে খানিকটা শীতল মাটির গন্ধ বয়ে আনলো বাতাস। নীরেন গিয়ে জানালা বন্ধ করে দিলো। কী জানি যদি ওগুলোর পেছনে আবার ছোরা উঁচিয়ে কেউ বসে' থাকে। নীরেন ভয়ে কেঁপে উঠলো। তারপর বাক্স থেকে রিভলভার আর টর্চ বার করে' সে ঘরের প্রতি আনাচ কানাচ তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করলে। কিন্তু কিছুই নেই।

এখন তার নূতন করে আবার ভয় হল' যদি চাকর টাকরের কিছু হয়ে থাকে। তাই চোরের মতো নিঃশব্দে সে ধীরে ধীরে তাদের ঘরের কাছে এল আর বন্ধ দরজায় কান দিয়ে শুনতে লাগলো। কিন্তু না, তাদের নাক ডাকার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। তবুও বিশ্বাস হল'

না, কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর্‌লো, তারপর আবার ফিরে এল। এখন মায়ের ঘর দেখা বাকী আছে। এ ঘর সম্বন্ধে তার একটু দুর্বলতা থাকলেও সে সাহস সংগ্রহ করে' এসে দরজা খুলে ফেল্লে। কিন্তু খোলার সংগে সংগে একটা ভ্যাপসা গন্ধ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। কেবল দু'চারটে আরশোলা টর্চের আলোয় নেচে উঠলো। আর মৃতুশীতল থম্‌থমে আবহাওয়ায় দম বিহনে অচল ঘড়িটা জ্বলে উঠলো। তাহলে এখানেও ভয়ের কোনো কারণ ঘটেনি। নীরেন নিজের ঘরে ফিরে এল'। কিন্তু সুস্থির হতে পারলো না। কেমন যেন এক দারুণ ভয়, এক অস্থিরতা অনুভব করতে লাগলো। তবুও ভালো, হাতটা এখনো পড়ে' আছে ঠিক নির্দিষ্ট স্থানে। কী বিপদ! এ অস্থিরতার কেমন করে' সে শেষ করবে? নীরেন উৎকণ্ঠিত হয়ে এই রহস্য ভেদ কর্‌বার জন্য হাতটার আরো নিকটে এগিয়ে গেল এবং টর্চের তীক্ষ্ণ আলোয় পরীক্ষা কর্‌তে লাগলো।

হাতটা ছোট, সাদা এবং কোমল। আর খুব সম্ভব এটা নিশ্চয় কোনো তরুণী বা যুবকের। নীরেন ঠিক ভাবে ব্যাপারটা কী হতে পারে তার কল্পনা করতে লাগলো। বোধহয় কোনো একটা খুনোখুনি ঘটেছিল এমন সময় এই হাতটায় বোধহয় এমন একটা অস্ত্র ছিল যেটা খুব হয়তো মারাত্মক, অমনি সময় পাশ থেকে এসে কোনো গুণ্ডা বা ওদেরি খুনে এক লোক হাতটায় দিয়েছে এক খাঁড়ার কোপ। ভাবতেও নীরেন কেঁপে উঠলো। তারপর এ ভাবনা মন থেকে মুছে ফেলে আবার নূতন করে' সে ভাবতে লাগলো। এ ভাবনা খুব ধীরে ধীরে তলিয়ে ভাবলো সে। ভাবলো, না এ হতে পারে না, কারণ হাতখানা মোটের উপর বেশ কমনীয় আর নারীর হাতই বা হবে কেন? পুরুষের হাত

ধরা যাক্ আংউলের তলায় গুঁড়ো গুঁড়ো যেন ছাই লেগে আছে। হয়তো ছাইয়ের গাদায় ফেলে এর মুখে আচ্ছা করে' পাঁচজনে ঘুসি মেরেছে তারপর একে তারা খুন করে' চুল্লীতে হয়তো হাতটা গুঁজে দিয়েছে। আর নিশ্চয় সে চুল্লীর মধ্যে আগুন ছিল না। কারণ তাই যদি হত' তা হলে হাতে পোড়ার দাগ থাকতো। কাজেই হত্যাকারীদের ধারণার ব্যতিক্রম ঘটেছে বা কী হয়েছে ভগবান জানে! না, এ ভাবনার কোনো মানে হয় না। নীরেন ভাবলো, হাতখানা বেশ তুলতুলে আর যৌবন-সুলভ এক মাধুর্য আছে এতে। বোধহয় এটা বাঁ হাত। কিন্তু তাই যদি হয় তা হলে আর একটা হাত কোথায় গেল—সেই ডান হাতটাই সম্ভবতঃ নীরেন সকালের আলোয় তাদের বাগানে আবিষ্কার করবে বা নিজের ঘরেই! না, এ চিন্তা অমূলক। কারণ কিছু আগেই তো সে নিজের ঘর খুঁজে দেখেছে। আচ্ছা, মনে হচ্চে যেন আংউলে একটা আংটী ছিল। হ্যাঁ এই তো তার পরিষ্কার দাগ। তা হলে সেটীও খুলে নিয়েছে হত্যাকারীরা! কী আশ্চর্য! এখনো নখ রয়েছে আংউলে, বেশ ভালো করে কাটা। এ সৌখীন লোক না হয়েই যায় না। হাতটা কাটা হলে কী হবে তবুও দেখতে সুন্দর, বাস্তবিকই চমৎকার। নীরেন তীক্ষ্ণভাবে আবার পরীক্ষায় মন দিলে আর নিশ্চিত হল' যে এ স্ত্রীলোকের হাত। শুধু স্ত্রীলোকের হাত নয়, মনে হয় সম্ভ্রান্ত ঘরের স্ত্রীলোক। কারণ বড় বড় সোসাইটিতে এমন হাত যেন কোথায় সে দেখেছে বলে' মনে হচ্ছে। হ্যাঁ এই হাত নিয়ে কাকে যেন সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে লিপষ্টিক ঘস্‌তে দেখেছিল নীরেন মনে করেও করতে পারলে না। সে পুনরায় সাহস সংগ্রহ করে' নিয়ে হাতটা স্পর্শ করলে আর দেখলে এটা ভেল্‌ভেটের মতো নরম কিন্তু মরে গিয়ে পাথরের চেয়েও শক্ত।

হাতটা তুলে নিলে হাতে কিন্তু আশ্চর্য হল' দেখে যে এটা অস্বাভাবিক ভারী। সত্যি, মরে' গেলে এত ভারীই হয়। নারেন আংউলগুলো সোজা করবার চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুতেই পারলে না। হঠাৎ তার ভয় হল', এ কী সে করতে যাচ্চে! কিন্তু থামতে পার্‌লো না। কারণ সংযমের চেয়ে কৌতূহল এখন তার বেশী। অবশেষে সে আয়নার দিকে চাইলে কিন্তু নিজেরই ভয়কাতর মূর্তি দেখে শিউরে উঠলো।

এখন কী করা যায়?

উপায় হচ্চে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা, কারণ এই মুহূর্তেই বড় বড় আইন ব্যবসায়ীদের জাগাবার জন্য সে ছুটতে পারে না। বা অন্ধকার বাগানে চাকরদের খুনী খোঁজবার জন্য জাগাতে পারে না। বা নিজেও নিস্তব্ধ পথে বেরিয়ে একটা হাংগামা ঘটাতে নারাজ। মোটের উপর খুনটা তার বাড়ীরই নিকটে কোনো জায়গায় হয় তো হয়েছে। আর এও ঠিক, খুনীরা এখন অনেক দূরে। বা এমনও হতে পারে যে খুনটা হয়তো সহরের সেই শেষ প্রান্তে ঘটেছে আর তার জেরটা টানবার জন্য মৃতের অংগ-প্রত্যংগ বিলানো হয়েছে আর এক প্রান্তে। কিন্তু যাই হক'; খুনটা মোট কথা অনেক আগে হয় নি। নীরেন ঘুরে এসে রিভলভারটা আবার হাতে বেশ শক্ত করে' ধরে জানালাটা খুলে দেখলে আর মুহূর্মুহু পিছনে চেয়ে হাতটা আগলাতে লাগলো।

সে একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর্‌লে কিন্তু দেখলে অসম্ভব। প্রথমতঃ সে ভাবলে এ জিনিষটাকে সে লুকিয়ে রাখবে এবং ভেবেই একটা ঝাড়নে জড়িয়ে যত্নের সংগে সে হাতটা তার সাজগোজের টেবিলের মধ্যে রেখে দিলে. কিন্তু রাখলে কী হবে, যদিও জিনিষটা চোখের সাম্‌নে থেকে লুকুলো কিন্তু মনের সাম্‌নে থেকে লুকুবে কেমন করে? নিজেকেই

সান্ত্বনা দেবার ছলে সাজগোজের টেবিলটাকে ভিন্ন করে দিলে ঘরের মাঝামাঝি একটা কাপড় টাংগিয়ে। আর বন ঘন চাইতে লাগলো। তার মনে দারুণ দয়া হল। হায়! কী বরাৎই না করেছিল এ! আর আসলে যে সব ঘৃণিত সমাজের সম্বন্ধে তার ধারণা আছে সেখানে এমন মেয়ে মানুষ খুনের ইতিহাস তো বিরল নয়।

খবরের কাগজ খুঁজলে সময়ে সময়ে এমন নাম গন্ধহীন অনেক মৃতদেহেরই তো খবর পাওয়া যায়। কিন্তু তবুও তার বিপদ ঘুচবে কিসে? মরুবো না বল্লে তো আব যমে ছাড়বে না! এখন কাল সকালেই পুলিশ আস্‌বে, সংবাদদাতা আস্‌বে কাগজের! বাপরে বাপ! নীরেন তিড়বিড়িয়ে উঠলো।

একটা বড দরের হাওয়ায় জানালার খড়খড়িগুলো কেঁপে উঠাতে হঠাৎ আবার নীরেন সচকিত হয়ে শক্ত করে' ধরলে তার রিভলভার। সে ভয় আর বিরক্তিতে চারিধারে চাইলো আব এই শীতেও তার কপাল দিয়ে টপ করে' এক ফোঁটা ঘাম ঝরে পড়লো। হঠাৎ তার মনে একটা প্রশ্ন জাগলো, আচ্ছা এত বাড়ী থাক্‌তে আমার বাড়ীতেই বা এই হাত-খানা ফেলে যাবার উদ্দেশ্য কী? কেনরে বাবা? সহরে আর লোক-জন নেই নাকী? এক পুলিস সাহেবের বাড়ীতে ফেল্লেই তো এটা পারতিস বা এক জমিদারের ছাতে ..? ভয় হল' তাই তো কেউ কী এই সুযোগে আমার উপর শত্রুতার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে না কী? তারি বা ঠিক কী?

নীরেন যতই ভাবতে থাকে, অসম্ভব অসম্ভব তত কল্পনা আসে মাথায়। সে ভাবতে লাগলো, আচ্ছা এই হাতের সঙ্গে কোনোকালে আমার কী সত্যিই পরিচয় আছে না কী? সে একটা জিনিষ যেন

আবিষ্কার করে মুগ্ধ হয়ে গেল।—হ্যাঁ, হ্যাঁ আছে ; নীরেন ভাবলো : আমি তাকে চিনি, এ হাত আমি দেখেছি, একটু স্থির ভাবে ভাবলেই আমি তাকে চিনতে পারবো। নীরেন ভাবতে লাগলো, সে আজ যে পার্টিতে দিনের বেলায় ছিল সেই পার্টির মধ্যেই এমন কোনো নারী বা পুরুষের এই হাতখানা কিনা। অবশেষে ভেবে কিছু স্থির করতে না পেরে পাগল হয়ে যাবার ধাক্কা থেকে রেহাই পাবার জন্য সে উঠে হেঁটে বেড়াতে লাগলো।

খানিকটা পরে নীরেন একটা বই তুললো হাতে এবং যে গল্পটা এতদিন আগে থেকে তার ভালো লেগে আসছে সেই গল্পই পড়বার চেষ্টা করলে। কিন্তু অসম্ভব তার এতে মনস্থির করা। প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক লাইন, প্রত্যেক ভাব-ই যেন সেই দু'টো কথায় ভরা —যেটা সে বরাবর ভাবছে. হাত আর মৃত্যু। অবশেষে প্রথম কথাটা সে তার চিন্তা থেকে বাদ দিয়ে দিলো। দাঁড়ালো এখন মৃত্যুকে নিয়ে। বাস্তবিকই, মৃত্যু ছাড়া জীবনে কী সত্য আছে? মৃত্যুর অনুভূতি তার মনকে ভাবিয়ে তুললো। তার মায়ের মৃত্যু, এই অপরিচিত স্ত্রীলোকটির মৃত্যু, আবার তার নিজের মৃত্যুও কখন আসবে কে জানে? আয়ু অতি অল্প, যাকে বলে দারুণ ক্ষণস্থায়ী আর তা শেষ হয়ে যায় সকলকার অজানিতে। কত জিনিষেই না মৃত্যু ঘটতে পারে? ধরো, অসুখ, একটা সামান্য দুর্ঘটনা, খানিকটা বদ্ধ বাতাস, খানিকটা ঠাণ্ডা, ঘোড়া থেকে প'ড়ে যাওয়া, কতো কী! দিনের মধ্যে প্রত্যেক মুহূর্তের-ই সুযোগ গুনছে এরা সব। তারপর আরো কতো কী আছে ; যেগুলোকে আমরা নিজেরাই ডেকে আনি। ধরো, উপেক্ষিতা রমণীর রাগ, ক্রুদ্ধ

স্বামীর অত্যাচার, শত্রুর প্রতিশোধ, ভেবে যা শেষ করা যায় না। নীরেন ফিরে গেল' তার সেই অতীতে। নিজের সুখের জন্য কতো কী-ই না সে করেছে। বরং মায়ের শাসনে সে রাখ্‌তো তার সংযম রক্ষা করে'; কিন্তু তারপর—তারপর, তার এই পশু-প্রবৃত্তির আর ক্ষমা নেই!

আপন মনেই নীরেন বল্‌তে লাগলো: আমার বর্তমান জীবনটা শুধু একটা অপমান। এ শুধু আমার মায়ের পবিত্র স্মৃতির পক্ষেই অপমান নয়, তার অদৃশ্য আত্মার পক্ষেও। এই হাত, সামান্য রহস্য-মণ্ডিত হাতের আর যাই উদ্দেশ্য থাক না কেন, এ আমাকে দিলে দারুণ শিক্ষা, দারুণ সাবধানতা। নচেৎ এ হাতটা যদি আজ আমার সাম্‌নে না এসে এমন করে' না উপস্থিত থাক্‌তো তাহলে' মৃত্যুর এতটুকু ভয় আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না মানুষ যখন আনন্দ করে তখন অবশ্যই সে মৃত্যুর ব্যথা ভেবে করে না। আর তাই যদি করতো, তাহলে' প্রত্যেক মুহূর্তে তার আনন্দ বিস্বাদ হয়ে যেতো, পৃথিবীতে কী দিনে কী রাতে সব সময়ই আর্তনাদ উঠতো আর সংগে সংগে বাড়ী-ঘর কোর্ট-বিদ্যালয় কোনো কিছুরই প্রয়োজন হতো না। তাই নয় কী? কিন্তু যা হয়েছে হয়েছে; এখনো দিন আছে; অন্ততঃ এই কটা দিন আমায় ভালো করে' থাক্‌তে হবে; আর খারাপটা বাদ দিলেও অন্তরের যে মহোত্তর প্রতিভা ও সদ্‌বৃত্তি আছে তারই চালনা করতে হবে। এবার আমায় বরণ করতে হবে সেই উন্নততর জীবন, যেখানে দুঃখের চিন্তাটা হবে গৌণ আর জ্ঞানলভ্য সুখটা হবে মুখ্য!

ধরো এই হাতটা, একটা ঠাণ্ডা মৃত হাত, এর কর্তা যে কোনো কারণেই মরুক না কেন কিন্তু এর আর কিছু মূল্য না থাক্‌লেও আমার

জীবনে এর সার্থকতা আছে। হ্যাঁ, দারুণ সার্থকতা বয়ে এনেছে এই হাত।

নীরেন চিন্তাতে একেবারে গভীর ভাবে ডুবে গেল' আর সে জান্‌তেই পারলো না কখন তার তন্দ্রায় মাথাটা নেমে এসেছে কোলের উপর। হঠাৎ কিসের একটা শব্দতে চোখ মেলে চাইতেই দেখে—সকাল। হ্যাঁ সকালই। এক চিল্‌তে রোদ এসে ছোরার মতো ঝলমল কচ্ছে জানালার গোড়ায়। মনে হল' হঠাৎ যেন সে এক দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছে, যে দুঃস্বপ্ন অর্ধেক রাত্রিতে তার টুঁটি টিপে তাকে হত্যা করতে যাবার উপক্রম করেছিল, আর টাংয়ানো পর্দার মতো কাপড়টার দিকে ভয়েতে না তাকিয়েই সে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলো চেঁচিয়ে, রামদীন, বন্‌স্‌রাজ, শীগগির, শীগগির, এখানে কী হয়েছে দেখবি আয়......

১৩-১২-৩৮

বৃদ্ধ অপরেশ বাবু আজ কিছুতেই ঘুমুতে পাচ্ছিলেন না। আসলে তাঁর ঘুমই আস্‌ছিলো না। শুধু চিন্তা...আর চিন্তা! চিন্তায় কখনো কারো ঘুম আসে না—আস্‌তে পারে না। তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। খুব ধীরে ধীরে বিছানায় উঠে বস্‌লেন। তারপর হাত বাড়িয়ে মাথার শিয়রের কাছে বিদ্যুতের স্থইচটা নাবিয়ে দিলেন।

ঘরটা নিমেষে আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো। জ্বলে' উঠলো আয়না আর জিনিষপত্র। টেবিল আর টেবিলের পালিস।...

একবার একটু তামাক খেলে হ'ত—বৃদ্ধ ভাবলেন। কিন্তু কে এত রাত্রিতে সে হাংগামা করে? তিনি খাট থেকে নেমে পড়লেন।

পাশের ঘর থেকে তখনো তাঁর মেয়ে আর জামাইয়ের হাসি আর কথার ছোট ছোট টুক্‌রো ভেসে আস্‌ছিল। রাত্রি অনেক।... কিন্তু হ'লে কী হবে, উপযুক্ত স্বামী-স্ত্রীর কাছে সময়ের জ্ঞান থাকে না। বৃদ্ধ অপরেশ বাবু মনে মনে একটু হাস্‌লেন। হঠাৎ কী ইচ্ছা গেল কে জানে, তিনি খুঁজতে লাগলেন—সেই ঘরের এতটুকু একটু ছিদ্র। যদি আড়ি পাতা যায় মন্দ কী? তা', স্থযোগ মিললো: দু'টো পাশাপাশি ঘরের মাঝখানেই একটা দরজা—দরজাটা বন্ধ, তার মাঝখানে একটা গর্ত আবিষ্কার ক'রে তিনি সেখানে টেনে আনলেন—তাঁর দৃষ্টি! তারপর যা দেখলেন—তা চমৎকার! কন্যা চামেলী জামাইয়ের গললগ্ন হ'য়ে কতো কী বল্‌ছে। আর জামাই·········

অপরেশ বাবু সরে' এলেন। বাপ হয়ে মেয়ে-জামাইয়ের প্রেম-লীলা দেখা তাঁর রুচিতে বাধলো। কিন্তু সব চেয়ে আনন্দ হ'ল এই ভেবে যে তাঁর মেয়েকে তিনি যোগ্য স্বামীতে দিতে পেরেছেন। মনে মনে তিনি আশীর্বাদ কর্‌লেন,—বল্লেন, এরা বেঁচে থাক,...ঈশ্বর স্থখে রাখো!

তারপর আবার তিনি বিছানায় বসে' পড়লেন। কিন্তু চল্লিশ বছর আগেকার একটা স্মৃতি বা একটা অনুভূতি কিছুতেই তাঁর মন থেকে সরছিল না। আজ যে কেমন করে' এটা মনকে প্রেতের মতো গ্রাস করে' ফেলেছে, সেইটাই তাঁর জানার বাইরে। হ্যাঁ চল্লিশ বৎসর আগেকার একটা স্মৃতি! রূপে আর আলোয় যা ঝলমল ক'রতো, বসন্তের বনে বনে উঠতো যার হিল্লোল, নদীর ঢেউ-এ ঢেউ-এ যা পড়তো, পিছল হয়ে। কী চমৎকার! আজ হয় তো সে ধোঁয়াটে হয়ে গেছে, জীবনের শীতে শীতে গুঁড়িয়ে গেছে, কিন্তু এককালে তার আকর্ষণ ছিল, তার মোহ ছিল। অপরেশ বাবু ভাবতে পারলেন না—এ কেমন করে' হয়। আজ তাঁর কন্যা যেমন করে' তার স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হয়েছে, বোধহয় কালিদাসের কালেও তখনকার মেয়েরা ঠিক এমনি হ'ত; হয়তো কোনো এক অজানা দ্বীপেও এমনি মেয়েরা তাদের প্রিয়তমদের হাত ধরে' বলে, তোমায় আমি ভালোবাসি!...হয় তো সুদূর গ্রীসে, রোমে, আরবের মরুভূমিতে, আফগানিস্থানের শূন্য-প্রান্তরে, জাহাজের সুবিশাল ডেকে কোনো চঞ্চলা তরুণী ঠিক এমনি করে'ই পুরুষের হৃদয় হরণ করেছে! এর শেষ কোথা? যা হয়ে গেছে, তা' আবার হবে। যুগে যুগে, কালে কালে ইতিহাসের একই ধারা, একই স্রোত, একই সত্য চলেছে। শুধু তরুণ আর তরুণীর জয়বাণী ঘোষিত হচ্চে—আকাশের নীচে; পৃথিবীর ছায়াপথে। সেখানে বৃদ্ধের স্থান কোথা? কিন্তু মানুষ তো একেবারেই বৃদ্ধ হয় না। আজ যার ছিল যৌবন, কাল তার আসবে বার্ধক্য আর তখন সে হবে বৃদ্ধ। বৃদ্ধ বেঁচে থাকে যৌবনের স্মৃতি নিয়ে আর যৌবনের স্মৃতির সমাধিই হচ্চে—বার্ধক্য।

অপরেশ বাবুর সে দিন এসেছিলো। এসেছিলো তাঁর যৌবন আর

সেখানে হিল্লোল তুলেছিল এক তরুণী, হ্যাঁ, তরুণীই! সে তাঁর পত্নী নয়—গৃহিণী নয়, বিবাহিতা স্ত্রীও নয় ।···বেশ্যা? বেশ্যা বল্‌তে তাঁর রুচিতে বাধে। বেশ্যা জগতে কারা? যারা পেটের দায়ে পুরুষের মনোরঞ্জন করে' দু'পয়সা রোজকার করে তারা যদি হয় বেশ্যা তবে জগতের তিন ভাগ নারীর মধ্যে এক ভাগ অভিজাত নারীকেই তো সতী বলা চলে। এই সব সখের সতীর মধ্যে কোথায় সেই স্বামীর ছায়া? কোথায় তাদের দীপ্তি? কোথায় তাদের প্রতিষ্ঠা? টুক্‌রো টুক্‌রো করে' নারীকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তবে তাদের মনের মাঝখানে যে দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যায় তা জগতের পূজায় লাগে কী? অথচ বেশ্যা.. নিরুপায় বেশ্যা...তারা পায় না সমবেদনা—দয়া - সতীদের পায়ের তলায়ও একটু স্থান!

যাক্—এ সব ভাববার তাঁর সময় নেই। বৃদ্ধ অপরেশ বাবু ভাবছিলেন, আসলে ভাবছিলেন, সেই চল্লিশ বৎসর আগেকার স্মৃতি। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল—আচ্ছা তাকে আজ দেখতে গেলে হয় না? দেখতে গেলে সে কী তাঁকে আজ চিন্‌তে পারবে না! মিথ্যা কথা—সে আজ নিশ্চয় চিন্‌বে। যদি বেঁচে থাকে চিন্‌বেই তাঁকে। বৃদ্ধ যেন অধীর হয়ে উঠলেন।

হঠাৎ কী মনে হ'ল.—ঘরের আলোটা দিলেন নিবিয়ে। আলোয় যেন আপনাকে চেনা যায় না। ..চেনা যায় না জগৎকে। তাঁর অনুভূতিতে তিনি নিজে-ই উদ্ধত হলেন। বাহির পানে তাকালেন।··· দেখলেন, পৃথিবীতে অজস্র জ্যোৎস্না। এই জ্যোৎস্নায় যেন জেগে আছে আত্মার উলংগ যৌবন।...স্বপ্ন! তিনি ভুলে গেলেন নিজেকে; ভুলে গেলেন ঘর-বাড়ী।– ভুলে গেলেন বার্ধক্য। বয়স যেন তাঁর চল্লিস বৎসর পেছিয়ে এল'। টপ ক'রে জামা পরলেন, গায়ে আলোয়ান

নিলেন; তারপর আলোটা আবার জেলে তিনি সংগ্রহ করলেন একটা বড় সৌখিন লাঠি। তারপর চলে' এলেন বাড়ীর দেউড়িতে।

কিন্তু বৃদ্ধের মন বোঝা ভার। আবার তিনি ফিরলেন। যে ঘরে চামেলী শুয়েছিল সেই ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালেন।—চামেলীকে একবার ডাকলে হয় না? মনে মনে ভাবলেন। কিন্তু তাকে ডেকে আর লাভ কী?...আবার সোজা রাস্তায় বেরিয়ে এলেন।...

বলতে ভুলে গেছি, আজ ছিল দোলের দিন। সারা রাস্তা আর পথ-ঘাট আবীর আর লাল-নীল রংয়ে ভ'রে গেছে। গ্যাসের আলোয় আর জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক টক্ টক্ কচ্ছে। বৃদ্ধ লাঠি নিয়ে চলতে আরম্ভ করলেন।

অদূরে একটা খালি ফেটিং যাচ্ছিল। অপরেশ বাবু দাঁড় করালেন। তারপর চ'ড়ে বসতে-ই গাড়ী রীতিমতো জোরে চলতে আরম্ভ করলো।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে ফেটিংটা এসে প্রবেশ করলো একটী অখ্যাত পল্লীতে। এ পল্লীর বর্ণনা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কারণ উপন্যাসসম্রাট থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিক বস্তি-সাহিত্যের খিস্তি লেখকের দলও এ স্বর্গের অল্প-বিস্তর আলোচনা করেছেন। আমি কে?

যাক্, অপরেশ বাবু নামলেন।

ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে তাঁর বহুকালের পরিচিত একটী বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লেন। নোংরা আর স্যাঁৎসেতে বাড়ী। সিঁড়ির ধারটা এমনি অন্ধকার যে রাত্রে ডাকাৎ লুকিয়ে থাকলেও টের পাবার যো নেই।.. উপরে উঠলেন। উপরে তখন কোলাহল একটু থেমে এসেছে। রাত্রি প্রায় তিনটে; থামবার-ই কথা! আস্তে আস্তে তিনি একটা ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। এই ঘরটায় বহুদিন পূর্বে—এখনো যতোখানি

মনে আছে—তাঁর সেই রক্ষিতা বিন্দুবাসিনী বাস করতো। বুকটা তাঁর অকারণে কেঁপে উঠলো। এখনো সে কী আছে না কী?

ডাক্‌লেন, বিন্দু...বিন্দু ..

হঠাৎ একটী মুখরা পতিতা সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল'—কাকে চাও গা বুড়ো?

—বিন্দু আছে? বৃদ্ধ অপরেশ বাবু ঝুঁকে পড়া দেহটাকে সোজা করবার একটা ব্যর্থ ভংগি ক'রে ভাংগা গলায় প্রশ্ন করলেন।

—কে তোমার বিন্দু? অত্যন্ত রূঢ় স্বরে পতিতাটী বল্‌লে।

—বিন্দু গো! বিন্দু বাসিনী,...বৃদ্ধ খুব দরদ দিয়ে বল্‌তে লাগলেন,—সে এই ঘরে থাকতো, আমায় বড় যত্ন করতো, তাকে খুব চমৎকার দেখতে ছিল ..

পতিতাটী বাধা দিয়ে নাক মুখ খিঁচিয়ে বলে' উঠ্‌লো, আহা মরি মরি!...এই ঘরে থাক্‌তো...যত্ন ক'রতো.. দেখতে সুন্দরী ছিল কী কথাই বল্‌লে প্রাণ!—বলি, বুড়ো বয়সে তোমার কী ভীমরতি হয়েছে, না মরবার পালক গজিয়েছে! একবার কাছে এসো না কানু,—দেখিয়ে দিচ্চি—

পতিতাটীর মুখ দিয়ে অজস্র মদ আর পিঁয়াজের গন্ধ বেরিয়ে এল'।

বৃদ্ধ উদাস-দৃষ্টিতে চারিধারে তাকিয়ে বল্লেন,—তুমি রাগছো কেন? না থাকে তো...

—রাগছো কেন মানে কী শুনি? পতিতাটী দিব্যি একটা হৈ চৈ তুল্‌লো বাড়ীতে।

সংগে সংগে অপরাপর ঘর থেকেও অন্যান্য যুগলেরা বেরিয়ে এলো। তারপর যা কাণ্ড হ'ল তা যেমন হাস্যকর তেমনি করুণ! অপরেশ বাবুকে

আচ্ছা ক'রে রং মাখিয়ে দেওয়া হ'ল। তাঁর মাথায় অন্যান্য চরিত্র-বানরা দাদুর সম্মান রক্ষার্তে মাখালো ফাগ, আবীর। কিন্তু বৃদ্ধ কিছুতেই কিছু নন। তিনি যেন আগুনের মতো জ্বলে' উঠেছেন। ...একান্তই মরিয়া! তাঁর সর্বশরীর কাঁপছে। চোখে তাঁর অপরূপ হিংস্র প্রাণীর দীপ্তি। তিনি চীৎকার করছেন—বিন্দু ..বিন্দুবাসিনী...

ঠিক এইর্ত মুহূর্তে যেটা ঘটলো তা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি চমৎকার।

কোথা থেকে বৃদ্ধা বাড়ীউলি উপরে উঠে এলো। তারপর গোরু-ছাগলের মতো সকলকে যে যার ঘরে পাঠিয়ে দিল! নিরুপায় বৃদ্ধের দিকে ফিরে একটা নিভৃত স্থানে আস্তে বললে।

তিনি আস্তে সে জিজ্ঞেস করলে,—তুমি কাকে চাও গা কর্তা?

বৃদ্ধ অপরেশ বাবু তখন রীতিমতো ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন। চোখের কোণে বোধহয় একফোঁটা জলও দেখা দিয়েছে। বল্লেন, আমি বিন্দুকে চাই—তুমি তাকে চেন?

—বিন্দুকে?...বিন্দুবাসিনীকে?—বাড়ীউলির গলা কেঁপে উঠলো।

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, কত্তো বার বল্বো?

—আ...আমিই সেই বিন্দুবাসিনী। বাড়ীউলি ধরা গলায় বললে।

—তুমি? অপরেশ বাবু প্রবল বিস্ময়ে যেন নড়ে' উঠলেন। —তু···তুমিই সেই বিন্দুবাসিনী?

—আর তুমি অপরেশ বাবু না?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি অপরেশ বাবু, আমি...

বৃদ্ধের কথা আটকে গেল। তাঁর সেই চল্লিশ বৎসর আগেকার একটা ইতিহাস যেন ভোরের শুকতারার মতো চোখের সাম্নে জ্বলে' উঠলো।

আর জ্বলে' উঠলো তাঁর শিরায় শিরায়, রক্তে রক্তে, তিক্ত আর তীব্র মদের মতো। বৃদ্ধ যেন আরো বেশী কাঁপতে লাগলেন।—সমস্ত ইন্দ্রিয় তাঁর দৃষ্টির মধ্যে সম্মিলিত ক'রে তিনি দেখতে লাগলেন, দেখতে লাগলেন, বিন্দুবাসিনীকে। তার সেই দেহের সুবাসিত আর সুকোমল চর্ম আজ নেই, নেই তার সেই রূপ, তার কণ্ঠে বীণাস্বর।—তার চক্ষে বিদ্যুৎ। যেখানে তিনি একদিন দেখেছিলেন অজস্র শ্যামলতা আর অজস্র দাক্ষিণ্য, সেখানে আজ মহাকাল টেনে দিয়ে গেছে বার্ধক্যের তুলিকা। নগর আজ রূপ নিয়েছে শ্মশানের। বসন্তের উদ্যানে এসেছে আজ শীতের ম্লানিমা।

তিনি দু'হাত দিয়ে বিন্দুবাসিনীকে স্পর্শ করলেন, স্পর্শ করলেন তার হাত, তার চোখ, তার মুখ, তার চুল, তার সর্বশরীর। বুঝলেন, নেই নেই আজ কোথাও এতটুকু সজলতা, এতটুকু আশ্রয় এ দেহে! সাদা হয়ে গেছে তার মাথার সমস্ত চুল, ঝুলে প'ড়েছে আজ তার চোখের শিথিল চর্ম, নির্বাসিত আজ তার মুখের সৌন্দর্য, শরীরে নেমেছে আজ জরার কদর্যতা। তিনি নিজেও আত্মার সংগে উপলব্ধি করলেন—তাকে দেখে উপলব্ধি করলেন, তাঁর বয়স কতো পেরিয়ে গেছে, কতো এগিয়ে গেছে। যৌবন?- যৌবন কখনো মরে না। কিন্তু যেখানে তার আশ্রয়, তার স্থায়ীত্ব, সেখানটা যদি ভেংগে যায় তবে সে কেমন করে' থাকবে? যৌবন বসন্তের কোকিল হ'তে পারে, কিন্তু শীতের অবিচ্ছেদ্য সংগী হ'তে কবে কে তাকে দেখেছে? অথচ শীত আসবেই। এ যেমন সত্য তেমনি মর্মান্তিক!

অপরেশ বাবু হাত উঠিয়ে নিয়ে প্রশান্ত তৃপ্তিতে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিন্দুবাসিনী কথা কইলে।

—এতদিন পরে এই রাত্রিতে কী মনে করে' ?

—এসেছিলাম তোমায় দেখতে !

বলে'ই বৃদ্ধ অপরেশ বাবু পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করে' বিন্দুবাসিনীর হাতে দিলেন।

সে কী বল্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু বৃদ্ধ কোনো কথা না শুনেই লাঠি ঠক্ ঠক্ ক'রে সিঁড়ি বেয়ে নীচের অন্ধকারে নেমে এলেন।

১—১২—৩৭

ভাংয়া দরজাটায় ধাক্কা দিলে খুব সন্তর্পণে লোকনাথ। পাছে সেটা শব্দ ক'রে ওঠে, এর জন্য তার যত্নের সীমা নেই। বাড়ীউলি তা হ'লে রক্ষে রাখবে না। এই রাত্রিতেই এসে চেঁচামেচি লাগাবে। দু'-মাসের তার ভাড়া পাওনা—বার টাকা! তার জন্য দজ্জাল-মাগী যেন হাতে মাথা কাটতে আসে।

ঘরটায় যেতে-ই একটা বিশ্রী গ্যাস লাগলো তার নাকে। একটা ধেড়ে ইঁদুর কুঁই কুঁই শব্দ করতে করতে কোন্ ধারে অদৃশ্য হ'ল। চতুর্দিক অন্ধকার—পাতালের মতো কালো। নীচেকার স্যাঁৎসেতে ঘর—ড্যাম্প উঠছে। লোকনাথ আসতে আসতে খুঁজতে লাগলো হারিখেনটা। পাওয়া গেল – ভাংয়া ঝুলপড়া হারিখেন। পকেট থেকে দেশলাইটা বার করলে। তাতে মোটে দু'টো কাঠি। একটা কাঠিতে জ্বালতে না পারলে-ই মুস্কীল। কোনো রকমে জ্বাললে। আলো ও তেমনি। যেন মুমূর্ষুর মতো ধুঁকছে! ঘরের রূপটা অন্ধকারে এতক্ষণ অজানা ছিল কিন্তু সেই ক্ষুদ্র আলোতে-ই মড়ার দাঁতের মতো সেগুলো যেন তাকে ব্যংগ ক'রে উঠলো। জানালার ধারে একরাশ মাসিক পত্রিকা।...বৃষ্টির জলে ভিজে উঠেছে। ঘরের মধ্যে ছড়ানো রয়েছে কুঁচো কুঁচো রাজ্যের কাগজ।...ধূলো!...মাছের কাঁটা! বোধ হয় দিনের বেলা কোনো বিড়াল এসে এখানে নিরিবিলিতে অপহৃত ভাজা মৎস্যের সদ্ব্যবহার ক'রে গেছে! কতকগুলো চড়াই পাখী এসে বাইরের কাটিকুটি এনে ছড়িয়েছে। এক কোণে ইঁদুর তুলেছে এক বালতি সিমেন্ট! দেওয়ালে টাংয়ানো তিনটে ছবি! একটা চার পয়সা দামের আর্শী! ছবিগুলো উইয়ে কাটলেও তার পদার্থ আছে কিন্তু আর্শীটা একেবারে রদ্দি হ'য়ে উঠেছে। পিছনের পারা খারাপ

হ'য়ে গিয়ে যাকে বলে একেবারে অপদার্থ!

একটা তাকে কাগজের ঠোংয়ায় কতকগুলো মিয়ানো মুড়ি ছিল। খুঁজে পেতে পিঁপড়েতে ঝাঁঝরা করা একটা রসগোল্লাও বেরুলো। সেগুলির সদ্‌ব্যবহার ক'রে লোকনাথ কোথা থেকে একটা ফাটা কাঁচের গেলাস সংগ্রহ করলে, তারপর কুঁজো থেকে তিন দিনের তোলা বাসি জল একটু, জন্তুর মতো ঢক্ ঢক্ ক'রে খেয়ে নিলে। এই তার রাত্রির আহার—এই তার সাহিত্যিকের জীবন! তারপর আবিষ্কার করলে কোথা থেকে একটা আধ-পোড়া বিড়ি। সেটা ধরিয়ে টানতে টানতে এক কুঁচো কাগজ চোখের সামনে টেনে আনলে, তাতে একটা কবিতা আছে!—সকালে লিখেছিলো। এক মনে পড়তে লাগলো;—

টুকরো টুকরো করিয়া ভেংয়েছি আমার সত্তা খানি,
ফেলিয়া এসেছি জীবনের স্রোতে সীতার ভূষণ সম,
নানান দেশের নানা উঁচু-নীচু পথে,
গুহায় গুহায় কাননে-মরুতে-পর্বতে-সৈকতে!
ছিন্ন-সতীর দেহের অংগ পারা—
হয় তো স্মৃতির নানান-তীর্থ দেউল গড়িবে তারা—
অদূর ভবিষ্যতে।
কিংবা মানব-রাঘবে নে' যাবে সুদূর-গহণ দেশে।
কীর্তি আমার দধীচি-অস্থি হ'য়ে,
ধরার আগুনে রবে অনন্ত আগ্নেয়গিরি নীল!
মিশরের পিরামিড—
ভুবনে ভুবনে হয় তো জাগিবে রাত্রি-প্রেতের মতো!
* * চরণ চিহ্ন আর সে যদি-ই হারায় মাটীর বুকে,

নানান চিহ্ন ধরিয়া আমার পূর্ণতা হবে স্থূল।

পড়া হ'তে-ই একটু হাসলে।...চমৎকার কল্পনা।

আলোও নিভে এলো সংগে সংগে। হারিকেনে তেল নেই। পলতে পর্যন্ত পুড়ে উঠেছে।

লোকনাথ একটা তুলো বার করা বালিস নিয়ে শুয়ে পড়লো।

নিদ্রার আগে কতো চিন্তা-ই মানুষের মনে আসে! সারা দিনের স্মৃতি, সারাদিনের খণ্ড খণ্ড ইতিহাস ভীড় ক'রে দাঁড়ায় পায়রার মতো! জীবনে সে পেলে কী? বড় জোর নাম, যশঃ আর ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে থাকবার জন্য দু'চারটে পয়সা। তাও অবহেলার দান। তা নয় তো কী? তারি বই নিয়ে আজ পাব্লিশার বড় লোক, তারি আশ্বাস-বাণী নিয়ে আজ পাঠক আনন্দিত, তারি বুকের রক্ত নিয়ে আজ ধনী ধনবান কিন্তু সে আজ একমুঠো অন্নের জন্য লালায়িত। সামান্য ক্ষুধায় খেতে না পেয়ে বেকারের মতো ঘুরছে দ্বারে দ্বারে, পার্কে পার্কে, জীবনকে ক'রে তুলেছে দুর্বহ, স্বদেশী ক'রে ক'রে মরছে জেলে জেলে পচে'! কার দেশ রে বাবা? স্বরাজ-ই বা কিসের জন্য? আজ যারা কনগ্রেসের নেতা তারা ই যে একদিন 'ক্রমওয়েল' হ'য়ে দাঁড়াবে না· তারি বা ঠিক কী? জন্ম যাদের কুলি হ'য়ে মেয়ে-পুরুষে খেটে মরবার, জীবনীশক্তি ক্ষয় ক'রে যাদের কথা হ'চ্ছে ক্যাপিটেলিষ্টদের পুষ্ট করা, কলিয়ারীর কয়লা খাদে খাদে যাদের নিয়তি হ'চ্ছে চাপা পড়বার, তাদের মুক্তির জন্য ভাববে ওই সব স্বার্থপর দেশনেতারা গদীর শয্যায় শুয়ে শুয়ে? তাদের 'ছ'পয়সার আহার স্মরণ করবে বিরাট পানপাত্রযুক্ত ভোজের টেবিলে বসে' ব'সে? তাদের দেবে স্বাধীনতা?—

হায়! স্বাধীনতা এত সহজ নয়! সে গাছের ফল নয়। তার জন্য প্রাণপাত সাধনা যে না করতে পারে তাকে কেউ হাতে তুলে দিতে পারে কী? মিথ্যাচার! বিরাট মিথ্যাচারে সত্য আজ দেবতার মতো লুপ্ত হ'য়ে উঠেছে। প্রতিভার আজ আদর নেই—গুণীর আজ সম্মান নেই। তা না হ'লে সেই বা মরবে কেন সাহিত্য সাহিত্য ক'রে? জীবনটা তো বেশ সোজা পথে কাটাতো। থাকতো পত্নীর একনিষ্ঠ বাহু-বন্ধন... দু'টী স্নেহনিবিড় চোখ. দু'টী সেবারত হাত! হঠাৎ সে হেসে উঠলো, মানুষের আশা কতোদূর-ই না ছোটে! না, আশা করায় আর দোষ কী? হিটলারও এমন চেয়েছিলো!

...ঘুমে তার চোখ বুজে এল'!

* * *

চৌরংগীর উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলেছে লোকনাথ। গায়ে এক ছেঁড়া সার্ট আর পরনে একখানা অর্ধমলিন কাপড়! পায়ের স্যাণ্ডেলটার একটা আংটা বুঝি ছিঁড়ে যায় যায়। তা হ'লে-ই অচল! জুতো আর তাকে বইবে না; তাকে-ই জুতো বইতে হবে! আলোর ঝর্ণা বেরিয়ে আস্‌ছে বিদেশী হোটেলগুলো থেকে। ফর ফর ক'রে ভিতরে ঘুরচে ফ্যান! সাহেব মেমেদের জড়াজড়ি ক'রে বলড্যান্স্, কনসার্ট, চক্‌চকে প্লেটের উপর চামচের ঠুং-ঠাং আওয়াজ—চমৎকার আভিজাত্য .. মধুর সভ্যতা! রাতের কলকাতা সহরকে জান্‌বে কে? লোকনাথ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ালো।

হঠাৎ পিছন থেকে তার কাঁধে হাত দিয়ে ডাক্‌লে—মর্মর! তার কলেজ-জীবনের এক ক্লাসের সহপাঠী ধনী বন্ধু! গায়ে গরদের পাঞ্জাবীর উপর রয়েছে দামী সিল্কের চাদর, পায়ে বার্ণিস করা সাহেব কোম্পানির

বাড়ীর জুতো, মাথায় ফুরফুরে কোঁক্‌ড়ানো উড়ন্ত চুল। দেহ থেকে বেরিয়ে আস্‌ছে চন্দনের মতো অগুরু সেণ্টের গন্ধ। রাস্তায় লুটুচ্চে তার সাদা ধবধবে কাপড়ের কোঁচা।

লোকনাথ ফিরে চাইতে-ই মর্মর উচ্চ হাস্যের তুফান ছুটিয়ে দিলে।

— আরে হ্যালো, লোকনাথ যে! তোমায় তো ভাই খুঁজে খুঁজে আমি হয়রাণ হলাম! ওঃ কতদিন পরে দেখা!...কী চমৎকার আজকাল তোমার লেখা হ'য়েছে হে, আমার তো পত্নী মাইরি তোমার লেখা পড়ে' কেঁদে-ই ফ্যালে। বলি, কোথায় আছ? আমাদের মতো দীনটিনদের তোমার মনে পড়ে?

লোকনাথ বিস্ময়ের ভাবটা কাটিয়ে মর্মরের দিকে চাইতে-ই তার দেহ আপনা থেকে লজ্জায় এবং দীনতায় সংকুচিত হ'য়ে উঠলো। এই মর্মর! ঘী দুধের চেহারা! কলেজে পড়বার সময় বেশ উদার ছিলো, আজো বোধহয় আছে। শুনেছিলো এ নাকী ব্যারিষ্টার হয়েছে, পাঁচ-ছ বছর আগে বিলাত থেকে ফিরেছে। কী চমৎকার দেখতে! কেমন সুন্দর মুখ, নাক, চোখ! ভগবানের সমস্ত আশীর্বাদ এ দু'হাতে লুটেছে। তার মাটীর সংগে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছা কর্‌লো। এর সামনে তাকে কী বিশ্রী-ই দেখাচ্ছে, যেন বাবুর কাছে সহিস, রাজার কাছে খেতে না পাওয়া এক চাষী!

লোকনাথ একরকম কুণ্ঠিত হ'য়ে বল্লে,—মনে ভাই যথেষ্ট পড়ে। থাকি এমনি...

তার যেন কথা কইতে মাথা কাটা যাচ্ছিল।

মর্মর সরলভাবে হেসে উঠলো।—চলো চলো, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা

ক'য়ে লাভ নেই। তোমার সংগে আজ অনেক আলাপ হবে, পালাতে চাইলে কিন্তু ছাড়বো না।

বলে'-ই এক রকম জোর ক'রে মর্মর তাকে ফুটের ধারে দাঁড় করানো মোটরের কাছে নিয়ে গিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকিয়ে দিলে। তার মধ্যে রজনীগন্ধার মতো কুড়ি বাইশ বৎসরের একটী যুবতী বসে'ছিলো। যেমন দেখতে শুনতে সুন্দরী তেমনি গায়ের বেশ-ভূষাও চমৎকার!... মুখখানি হাসি হাসি। মর্মরের নব-বিবাহিতা পত্নী। সে একটু বিব্রত হ'তে যাচ্ছে এমন সময় মর্মর ভিতরে ঢুকে বল্লে,—শীলা, এই তোমার লোকনাথ,...পপিউলার রাইটার।

শীলা যেন একটু লজ্জায় পড়ে' গেল তারপর ছোট একটী নমস্কার করলে।

আর লোকনাথ ভাবলে, এই কাপড় জামাতে বুঝি বা তার মৃত্যু হলে'ই ভালো ছিলো।

মোটর চলতে সুরু করলো।...ভিতরে 'রেডিয়ো'...বৈজ্ঞানিক যুগের চরম বিলাস সামগ্রী!

মর্মর বল্লে, কী চুপ ক'রে আছ যে? কথা কও। তোমরা তো লেখক মানুষ, লজ্জা কিসের? তারপর···খবর কী?

লোকনাথের গলা যেন কে আটকে ধরেছে। কী কথাই বা কইবে? ধনীর সংগে বসবার তার যোগ্যতাই বা কোথা? নেমে যেতে পারলেই যেন সে স্বস্তি বোধ করে। বল্লে, কেটে যাচ্ছে এক রকম...আমায় নিয়ে চললে কোথা?

—আমাদের বাড়ী হে, আমাদের বাড়ী, তোমায় ইলোপ ক'রে নিয়ে যা'চ্ছ।

মর্ম্মর গলা ছেড়ে আবার হেসে উঠলো। তারপর সোনার সিগারেট-কেস বার ক'রে লোকনাথের সাম্‌নে ধরলো। অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোকনাথকে নিতে হ'ল। ধরালে।

এবার শীলা কথা কইলে।—আজ কিন্তু আমাদের বাড়ী আপনাকে পায়ের ধূলো দিতে হবে। আপনার নূতন বই'এর কী প্লট ফাঁদ্‌ছেন তা আমরা শুন্‌তে চাই।

শীলার মুখে হাসির ঝর্ণা বহে গেল।

কুণ্ঠিত লোকনাথ শুধু একটু হাস্‌লে।

প্রায় পনেরো মিনিট ধরে' অনেক কথা-বার্ত্তা হ'ল। শেষে মর্ম্মর চেপে ধরলো, চলো, তোমার বাড়ী দেখবো।

লোকনাথ এক রকম কাতর হ'য়েই বল্লে,—না দরকার নেই ভাই... সে স্থানে তোমরা যেতে পার্‌বে না—সে স্থানে তোমরা যেতে পার্‌বে না—সে নরক। গেলে নাকে রুমাল দিতে হবে—এমন দুর্গন্ধ! এ আমি সত্য ক'রে বল্‌ছি। কেন মিছামিছি...

কথা শুনে মর্ম্মরের রোক চেপে গেল।—সাহিত্যিকের ঘর দেখবই, যাবই। শেষকালে লোকনাথের ঘরে তারা গেলই। সেই নোংরা ঘর...অন্ধকূপ...নর্দ্দামা...বিশৃংখল চতুর্দ্দিক।

—আরে রাম রাম! মর্ম্মর যেন ক্ষেপে উঠলো।—এই ঘরে তুমি থাকো, সাহিত্য-সাধনা হয়? মারা যাবে যে! কিছুতেই বন্ধু হ'য়ে আমি তা হ'তে দিতে পারি না। আমি তোমায় আমাদের বাড়ী নিয়ে যাব। এ ঘর তুমি ছাড়বে কী না? মর্ম্মর সত্যই নাকে রুমাল লাগালে এবং বন্ধুত্বের সৌহার্দ্দ্য তাকে যেন শৃংখলের মতো জড়িয়ে ধর্‌লো।

শীলাও বল্লে,—আপনাকে যেতেই হবে; আমরা থাক্‌তে আপনার মতো সাহিত্যিকের অপমৃত্যু ঘটতে দেবো না।

ভগবান যাদের ভালো করেন তাদের সবটাই যেন ভালো করেন। স্বামী-স্ত্রী—দু'জনকে দেখলে যেন হিংসা হয়।. কিন্তু লোকনাথ এ ক্ষেত্রে 'মরিয়া' হ'য়ে উঠলো। মর্মরকে আলাদা ডেকে বল্লে,—তা হয় না ভাই; প্রথমতঃ এই ঘরেই আমার সাহিত্যের 'ইনেসপিরেসান' পাই, দ্বিতীয়তঃ তোমাদের সেখানে পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকা আমার বিবেকে বাধবে; তৃতীয়তঃ এখান থেকে সরতে গেলে এখন খরচ আছে।

মর্মরের হঠাৎ চোখ ছল ছল ক'রে উঠলো। লোকনাথের দু'টো হাত চেপে ধরে' বল্লে,—ভাই, তুই আমাকে এত পর ক'রে দিয়েছিস্? আমার বাড়ী যাবি, তাতেও তোর সংকোচ? 'ইনেস্‌পিরেসান' আমার বাড়ীতেও আছে। এখান থেকে সরতে কিসের খরচ? আমি দিচ্চি! আর তোকে পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে থাক্‌তে হবে না লোকনাথ। যাতে তুই আমায় কিছু দিতে পারিস তার জন্য না হয় এমন ব্যবস্থাও ক'রে দেবো। তুই খালি লিখবি আর লিখবি। অকালে আমি যেন তোকে বাঁচাতে পারি—এই গৌরব আমার হয়।

* * মর্মর বাড়ী ভাড়া-টাড়া মিটিয়ে দিয়ে লোকনাথকে মোটরে উঠিয়ে নিয়ে সস্ত্রীক চলে' এল'।

লোকনাথের হ'ল নূতন জীবন। মর্মর তার জন্য একটা ছাদের ঘরে থাক্‌বার ব্যবস্থা করে' দিয়েছে—তিন তলার উপরে। সেখান থেকে চাইলে অনেক দূরে কতকগুলো নারিকেল গাছ দেখা যায়। দেখা যায়—দিগন্তের বনানী-রেখা। খর-রৌদ্রে সেধারে চেয়ে থাক্‌লে মন যেন উন্মনা হ'য়ে ওঠে।

ঘরে নানান ছবি। ঠাকুর-দেবতার নয়।—বড় বড় শিল্পীর আঁকা। একটা হচ্চে, প্রলয়কালীন অগ্নির মাঝে রুদ্রদেব নটরাজের নৃত্য কর্‌ছেন। আর একটা হচ্চে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপন-পুরী। দেখলে ঠিক বোঝা যায় না...অনুভূতির রহস্য। আরো রাজ্যের নানান দৃশ্য; যেমন নিশীথিনী, সমুদ্রে সূর্যাস্ত, ঝড়ের রাতে বেদুইন ইত্যাদি ইত্যাদি।

শুধু তাই নয়—ঘরটা যেন লাইব্রেরী। রাজ্যের প্রবীণ এবং নবীন লেখকদের নানা বিষয়ক গ্রন্থাবলীতে পাঁচটী আলমারী ভর্তি। একধারে একটী টেবিল, তার উপর চক্‌চকে বাঁধানো চার-পাঁচখানি খাতা। দোয়াতদানী, কলম প্রভৃতি লেখবার সরঞ্জামের বিপুল আতিশয্য! ইজিচেয়ার আছে দু'খানি। মেঝেয় কার্পেট পাতা,...একটি ছোট্ট পালংক, তার উপর দুগ্ধফেননিভ শয্যা। একধারে দু'টি কাঁচের জার, তার মধ্যে লাল মাছ পুচ্ছ নাচাচ্চে। ঘরের বাইরেই টবে পোঁতা নানান গাছ; গোলাপ-গাঁদা-পাম প্রভৃতির। লিখতে লিখতে যখন লোকনাথের বিরক্তি আসবে,—মর্ম্মর বলে' দিয়েছে, তখন সে এই সমস্ত দেখবে। তার শান্তি আস্‌তে পারে। এ ছাড়া মর্ম্মরের হুকুম বাড়ীর উপর আরো বেশী। লেখককে কেউ যেন না বিরক্ত করে। তার যখন ইচ্ছা হবে সে খাবে, যখন ইচ্ছা হবে সে মোটর নিয়ে বেড়াতে যাবে। শীলা ইচ্ছা কর্‌লে আস্‌তে পারে আর কাউকে দরকার হ'লে লোকনাথ কলিং বেল বাজাবে। অমনি তৎক্ষণাৎ...

ক'টা দিন মন্দ গেল না। লোকনাথ ছাদ থেকে সমস্ত দেখতে লাগলো। ওই লোকজন, চাকর-বাকর, বন্ধু-বান্ধব বেশ আছে। সবেতে একটা শৃংখলা, একটা শান্তি। কিন্তু দুনিয়ার বুভুক্ষুদের সংগে এদের যোগ কোথা? সেই তো অন্ধকূপে তারা এখনো পড়ে' আছে;

রাজার দারোয়ানের কাছে গিয়ে বুক চাপড়াচ্ছে—ওগো রুটি দাও, খেতে পাচ্চি না, খিদেয় মারা গেলাম! আর একদিকে অযথা ব্যয়···রেসকোর্স...বাগান পার্টি···জুবিলি ফণ্ড...মেট্রো...বাহাল তবিয়তে ..বাঃ! কিন্তু এ সব ভেবেই বা লাভ কী?

সে লিখতে বসে। কিন্তু ওই বাঁধানো খাতা আর আস্‌বাবপত্রের দিকে চাইলেই তার যেন ভাব কোন্‌ দিক দিয়ে উবে যায়। মহা মুস্কীল। সে একটু ঘোরে, আবার লেখে, আবার কেটে যায় ভাব। দুত্তোর লেখা! বলে' সে উঠে পড়ে।

প্রতিদিন এই ভাবেই চলে। লেখা আর তার হয় না। শীলা গোলাপফুলের তোড়া ঘরে এনে ফুলদানীতে রাখবার সময় জিগ্যেস করে,—কী লিখলেন কবি?

কবি উত্তর দেয়— ঘোড়ার ডিম!

—কেন বলুন তো? আপনি আর লিখতে পারেন না কেন?

শীলা হাস্‌তে হাস্‌তে প্রশ্ন করে।

—বোধহয় আমার প্রতিভা ফুরিয়ে এসেছে; লোকনাথ জবাব দেয়।

—আপনি কোনো জায়গায় বেড়াতে-টেড়াতে যাবেন? ধরুন এই দার্জিলিং-টার্জিলিং...অনেক দূরে?—শীলা প্রশ্ন করে।

লোকনাথ বলে,— যাবো রাঁচি।

ওমা, রাঁচি যাবেন কেন? শীলা খিল খিল করে' হেসে ওঠে।

তারপর অনেক কথা কয়ে' চলে' যায়। মর্মরকে বলে, দেখ, কবির আমি ভাবান্তর লক্ষ্য কচ্চি। ওঁর বোধহয় এখানে মন টিক্‌ছে না।

মর্মর গিয়ে বলে, হ্যাঁ হে লোকনাথ! তোমার নাকি ভালো লাগছে না এখানে?

লোকনাথ মনের কথা গোপন করে' অন্য কথা পাড়ে।

আরো কয়েক দিন কেটে যায়। .....

লোকনাথ আর্শীতে দেখে তার চেহারায় লাবণ্য এসেছে। দাড়ী-গোঁফ কামাতে তাকে সুপুরুষ দেখাচ্চে। আর্শীর সংগেই সে ভাব করে,—এই তো চাই good...good !

...মোটরে বেড়াতে যেতে তার লজ্জা করে। কারণ তার-ই পথচারী কম্‌রেডরা হয় তো দেখলে ক্ষুণ্ণ হবে। ভাববে—ভণ্ড। তার চেয়ে এই ঘরেই সে বেড়ায় প্রেতের মতো! পালংকের তোষকের উপর সে শুতে পারে না। বিছানাটা যেন কাঁটার মতো তার গায়ে বেঁধে।...সে মেঝেটার একধারে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে।

কিন্তু মানুষের সুখে থাক্‌তে ভূতে পায়; কিংবা যাদের ভূতে পায় তাদের সুখটা হয় তো অন্য প্রকৃতির। তাই হঠাৎ একদিন লোকনাথ বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। কারণ-অকারণের বালাই নেই। সে যে ছেঁড়া সার্ট আর অর্ধমলিন কাপড়টা পরে' এ বাড়ীতে ঢুকেছিলো সেইটাই কোথা থেকে আবিষ্কার করে' গায়ে চড়ালে এবং মর্মরের ঘর চড়াও কর্‌লে।

মর্মর তখন চুরুট টান্‌তে টান্‌তে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে কী একখানা ইংরাজী উপন্যাস পড়ছিলো। লোকনাথ সহসা সোজা গিয়ে বল্লে,—ওহে, কাক আর সোণার দাঁড়ে থাক্‌বে না, সে আঁস্তাকুড়ে আবার ফিরে যেতে চায় ..আমি যাচ্চি।

কথাটা সমস্ত না শুনেই মর্মর তড়াক্‌ করে দাঁড়িয়ে উঠলো।—কী বল্লে ?

—আমায় যেতে হবে ভাই; লোকনাথ বেশ স্পষ্ট ভাবে বল্‌লে,

আমি আর থাক্‌তে পাচ্ছি না। পৃথিবীর হাহাকার আমায় নিশির মতো ডাক্‌ছে। আমি চল্লাম !...সে পা বাড়ালে।

মর্ম্মর যেন সহসা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। পাগলের মতো টপ করে' ছুটে গিয়ে লোকনাথের হাত দু'টোকে জড়িয়ে ধরে' চীৎকার করে' উঠলো,—লোকনাথ, লোকনাথ! তুমি এ কী বল্‌ছো ভাই? যেতে পার্‌বে না—আমার বুক ভেংয়ে দিয়ে যেয়ো না! যেয়ো না ভাই! জ্ঞানতঃ আমি তো তোমাকে কোনো কষ্ট-ই দিই নি।

হঠাৎ তার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে' মুক্তার মতো কান্না এলো।

গলার স্বর গেল আটকে। এ যে আশাতীত! সে যে তাকে কতো ভালোবাস্‌তো তা সে ছাড়া আর কে জানে?

কিন্তু লোকনাথ অটল। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে' গেল।

মর্ম্মর ঝড়ের মতো লাফালাফি কর্‌তে লাগলো। শীলা ঘরে আস্‌তেই তার সাম্‌নে আছাড় খেয়ে পড়ে' গিয়ে বাণবিদ্ধ হরিণ-শাবকের মতো চেঁচিয়ে উঠলো,—শীলা, শীলা, কবি আমাদের চলে' গেল...চলে' গেল! তুমি জানো...জানো...ও কেন গেল? অশ্রুসজল আরক্তিম জিজ্ঞাসাপূর্ণ চোখদুটো সে শীলার সাম্‌নে তুলে ধর্‌লো।...মুখে তার লতানো চুলগুলো তখন ঝুলে পড়েছে।

*　　*　　*

ফট্‌ ক'রে লোকনাথের স্বপ্ন গেল ভেংয়ে। চোখ চেয়ে দেখে—কোথায় মর্ম্মর আর কোথায় তার বিরাট রাজপ্রাসাদের মতো অট্টালিকা। সেই বাস্তব...নিষ্ঠুর বাস্তব...তার সামনে, তার আসে-পাশে...তার সর্ব্বত্র। অন্ধকূপে এক ফালি প্রভাতের রোদ এসে ঝিক্‌মিক্‌ কর্চ্চে। সেই মাসিক পত্রিকা, সেই ইঁদুরে তোলা সিমেণ্ট, সেই ভাংয়া আয়না,

সেই নোংরা কাপড়, সেই ছেঁড়া-খোঁড়া কাগজ যেখানে যেমনটী রাত্রিতে ছিল ঠিক সেই রকমই বিরাজ কচ্চে। বিরাজ কচ্চে বল্‌লে ঠিক বলা হয় না, – বরং সকালের আলোয় যেন তাদের নগ্নরূপ আরো বিকট হ'য়ে উঠেছে।

লোকনাথ উঠে বস্‌লো আবার তার সামনে দীর্ঘ দিন···সংগ্রামের দিন···তপস্যার দিন।

বাইরে বেরুতে যাচ্ছে, এমন সময় বাড়ীউলির সংগে দেখা। কোনো রকমে কুকুরের মতো আত্মগোপন করে' পালাবে ভেবেছিলো কিন্তু সেটী হ'ল না। বাড়ীউলি ঝাঁটা হাতে আস্ফালন ক'রে উঠলো, দেখ নবাব পুত্তুর, ঘরের ভাড়া যদি না দাও তো, ঝেঁটিয়ে তোমার...

লোকনাথ অপরাধীর মতো থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লো।

চমৎকার তার জীবন ! চমৎকার তার সকাল !...

—১৯৩৭

পরিহাস

চায়ের দোকানে খবরের কাগজটা পড়তে পড়তে হঠাৎ মদনের মনোমত বিজ্ঞাপনটির দিকে নজর পড়ে' গেল। ঠিক এমনিই সে খুঁজছিল। মদন ভাবলে, ঠিক এমনি এক লোকের সন্ধানে সে এই মুহূর্তে-ই যেতে রাজী আছে যে আশ্চর্য বিদ্যাবলে তার ভবিষ্যৎ গণনা করে' বলে' দেবে। পয়সা নেয়—নি'ক। কিন্তু সত্য কথাটা তাকে জানাতে হবে। মদন চায়ে চুমুক দিতে দিতে বিজ্ঞাপনটীতে ভালো করে' চোখ বুলাতে লাগলো আর আনন্দে তার আত্মা নেচে উঠলো। বড় বড় হরফে লেখা :

"অপূর্ব জ্যোতিষী—অদ্ভুত ক্ষমতা ;......

মাত্র কণ্ঠস্বর শ্রবণে ভবিষ্যতের সব কিছু বলিয়া দিবেন।

বোগদাদ, কাবুল, কান্দাহার, এমেরিকা, ইউরোপ সমস্ত স্থানের মনিষীদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপত্র পড়িলে তাঁহার গুণপনার বিষয়ে আশ্চর্য ধারণার জন্ম হইবে।

কলিকাতায় মাত্র এক সপ্তাহের জন্য আসিয়াছেন। দক্ষিণা সামান্য। ক্যাম্বেল হাসপাতালের বিপরীত দিকে খোঁজ করুন।"

মদন যত পড়ে তত অবাক হয়ে যায়। কে এ জ্যোতিষী? শুধু গলার স্বর শুনে বলে' দেবে ভবিষ্যৎ? এ তো ভয়ানক কথা দেখছি! আচ্ছা, এই যে মাত্র দু'ঘণ্টা আগে মদন একখানা ডারবীর টিকিট কিনেছে এটা সম্বন্ধে সে বলতে পারবে কী? কেন পারবে না? যে গলার স্বর শুনে ভবিষ্যৎ বলে' দিতে পারে তার কাছে অসাধ্য কী আছে? লাগে তো একবার...! আরে বাপরে বাপ! মদন তো একেবারেই লাল হয়ে' যাবে! তখন কী আর বাবুর গাড়ী চালাবে, না এই দুপুর রোদ্দুরে টো টো করে' বাবুকে নিয়ে ঘুরতে যাবে ময়দানে!

দেবে এক গুঁতো। ঘা ভাগ শালা...অনেক বড় লোক দেখেছি! দিস্ তো মোটে পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে !...একটা মোটর ড্রাইভারের মাইনে কী এমনি ছিল না কী? না, ভদ্রলোকের ছেলে এই মাইনেতে চালাতে পারে? আর গোখ্রো—মানে তার পরিবারও ইদানিং বড় বেড়ে উঠেছে। দু'টো পয়সার জন্য যেন বড্ড বেশী ব্যতিব্যস্ত করে' তুলেছে। আরে সবুর কর না মাগী! মদন যতো বোঝায় ততই অবুঝের মতো ও চেঁচামেচি আরম্ভ করে। মেয়েছেলে জাতটাই এক রকমের। না, এই দুঃখে মদনের সত্য সত্য-ই বাড়ী যেতে ইচ্ছা করে না। যতো অশান্তি ঘোড়ার-ডিম ওই বাড়ীতে।...যদি ডারবীর টাকাটা...

মদন একবার গোঁফটায় চাড়া দিয়ে উঠলো। নাঃ, এই সুযোগে জ্যোতিষীর কাছে না গেলে চল্ছে না। দেখা যাক্—বরাতে কী আছে! তা পয়সা লাগে—লাগুক্! দেবে সে দু'পাঁচ টাকা! এর বেশী তো নয়! তবে রাস্তায় যে-সব গণৎকাররা বসে' হাত দেখে, ওদের কাছে আর মদন প্রাণ গেলেও যাবে না। সব ব্যাটাকে জানা আছে। সেবার চারটে পয়সা নিয়ে এক জোচ্চোর কী ঠকানটাই ঠকিয়েছে। বলে কী না পাখীতে গণনা করবে! আরে দূর হতচ্ছাড়া! মানুষ যেখানে দাঁড়াতে পারে না, সেখানে তোর ওই পাখীতে লেফাফা টান্বে? তার মধ্যে লেখা আছে কী? যতো সব আজগুবি! আজগুবি! মানুষের বরাৎ কী এতই ছোট যে তা ধরা পড়বে ওই একখানা কাগজের লেখায়? আরে রাম! রাম! মারো ঝাড়ু!

মদন টপ করে' একটা বিড়ি জ্বালালো। আর জালিয়েই দোকানের পয়সা-টয়সা মিটিয়ে দিয়ে সে নেমে পড়লো রাস্তায়। মাথাটায় বেশ বোঝা যাচ্ছে কেমন এক দারুণ চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। আর আশ্চর্য তো

নয়—কেনই-বা সে পাবে না ? এই তো সে-দিন শোনা গেল ই-বি-আর না ই-আই-আরের কে-একজন মেথর ফার্ষ্ট প্রাইজ পেয়েছে। তাই-বা কেমন করে’ ? সাহেবের কাছ থেকে ! সে প্রত্যেক দিন মেথরটাকে ডেকে দিত’ আচ্ছা করে’ চাবুক তারপর যখন ও হাউ হাউ করে’ কেঁদে উঠত তখন দিত’ কিছু কিছু টাকা। তা না হলে’ একবারে যে সে অত টাকা পেয়ে পাগল হ’য়ে যাবে! আর মদন যখন পাবে! আরে লে লে, ও টাকা দেখে মদন মিস্তির পাগল হবার ছেলে নয়।

মদন চলে’ এল’ সোজা তার বাড়ীতে। কাউকে এখন কিছু বল্‌লে না। তারপর গোটা পাঁচেক টাকা নিয়ে বিকাল হবা-মাত্রই সে চল্‌লো ক্যাম্বেল হাস্‌পাতালের দিকে।

দেখলে ওখানকার বড় রাস্তার উপরেই একটা দোকান। ঠিক দোকান নয়, ছোটখাট সাজানো গোছানো একখানা ঘর। ভিতরে দু’পাঁচখানা চেয়ার পাতা আছে। আছে দু’টো ফুলদানী। তাতে কতকগুলো ফুল বসানো আছে। আছে বাইরে টাংয়ানো একটা মস্ত-বড় সাইনবোর্ড। তাতে মানুষের নানা রকমের হাতের চেহারা আঁকা আছে। আর দরজা দিয়ে ঢোক্‌বার মুখেই আছে একটা টেবিলের উপর দু’টো মড়ার মাথা। এই ঘর না কী ?

মদন একবার মাথা চুল্‌কে ভাবলো। তারপর-ই সাহস করে’ ভিতরে ঢুকে পড়লো। সংগে সংগে তাকে টপকে কোথা থেকে একটা লোক এসে অভ্যর্থনা আরম্ভ করে’ দিলে। বস্‌বার জন্য এগিয়ে দিলে চেয়ার। হাওয়া খাওয়ার জন্য ঘুরিয়ে দিলে ফ্যান। তারপর কী চাই বা কী কামনা তা সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলে।

মদন বল্‌লে, ভবিষ্যৎ জান্‌তে চাই। কী রকম চার্জ পড়বে বলুন?
...কোথায় জ্যোতিষী?

লোকটা বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ জানবেন বই কী, প্রত্যেক প্রশ্নে একটাকা করে' দিতে হবে।...জ্যোতিষীজী ভিতরে আছেন।

বলে'ই ঘরের মধ্যে একটা পর্দা সরাবা-মাত্র ছিটে-ফোঁটা কাটা এক ভদ্রলোকের মুখের আধখানা দেখা গেল নিমেষে।

মদনের মনে কী ভাব গেল কে জানে। বল্‌লে, একটা প্রশ্নই আমি কর্‌তে চাই। এই নিন টাকা। বলে'ই ঝনাৎ করে' একটা টাকা বার করে' ফেলে দিলে টেবিলে।

আর সংগে সংগে সেই চেলাটা (চেলা ছাড়া আর কী বল্‌বো?) তাকে পর্দা সরিয়ে জ্যোতিষীর সাম্‌নে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত কর্‌লে।

জ্যোতিষী মদনকে দেখেই ধ্যান-মগ্ন হয়ে' পড়লেন। তারপর কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে চোখ চাইতে লাগলেন। গ্রহণ ছেড়ে গেলে চাঁদ যেমন চোখ চায়। তারপর অতি মিহি-স্বরে বল্‌লেন—আপনার কিসের ভাবনাটা বেশী, আমি তা জানি। পয়সার জন্য আপনি কষ্ট পাচ্ছেন, না? পয়সা আপনার হবে খুব শীঘ্রই।

এ কথা শুন্‌লে কে না খুসী হয়। মদনও খুসী হল' আর খুসী নয়, রীতিমত উৎফুল্ল। বললে, ঠিক বলেছেন আপনি—আমি একখানা লটারীর...মানে ডারবীর ..

থামুন--জ্যোতিষী সবেগে তাকে বাধা দিলেন।—আমি আগেই জানি তা। আর এ-ও জেনে রেখে দিন আপনি প্রথম-পুরস্কার পাবেন। আপনার হাতে যা একখানা রেখা আছে তা দারুণ শুভকাজের সূচনা করে।

সত্যি! সত্যি! মদন কী এখন-ই লাফিয়ে উঠবে না কী? এঁ্যা! ইনি বলেন কী? তাই তো! হাতে যে রেখা আছে এ বিষয়ে মদন নিঃসন্দেহ। কারণ বছর দুই পূর্বে ঠিক এই কথাই একটা বড় জ্যোতিষী বলে' ছিল। কিন্তু ইনি জানতে পারলেন কী করে'? হাত তো ইনি দেখেন নি!…তবে কী…কোনো দৈবসম্পন্ন ব্যক্তি ইনি না কী?

মদন জ্যোতিষীর কাছ ঘেঁসে আরো এগিয়ে গেল আর হাতটা প্রসারিত করে' দিয়ে উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলো—কৈ! রেখাটা দেখান দেখি! দেখান…দেখান…

সহসা সেই চেলাটা এসে তাকে ধরে' নিয়ে গেল। বললে, আপনার একটা প্রশ্নের জবাব দেওয়া হ'য়ে গেছে। এরপর পয়সা লাগবে। আর উনি তো হাত দেখেন না। এখন যান্…

যাব'? যাব'? মদন পাগলের মতো বেরিয়ে পড়লো। আরে বাপরে বাপ! বরাৎ তবে সত্যই ফির্‌লো না কী! এঁা! দুনিয়ায় তাহলে' আর সে গরীব রইলো না! হল' কী এ! আরে, জ্যোতিষীর পায়ের ধুলো নেওয়া হল' না যে! অ্যাঁ! এখন সে কী কর্‌বে?

নাচবে? কাঁদবে? বাড়ী তৈরী করার অর্ডার দেবে? গোখ্‌রোর গহনা গড়িয়ে দেবে? কী কর্‌বে সে? কী কর্‌বে? এত আলো সে সহ্য কর্‌বে কী করে'? এত শব্দ…এত আনন্দ!…

এখন? এখন? মদন যাবে কোথা? বাড়ী! বাড়ী যাবে সে! আহা বাড়ী কী করে' যাবে? তার যে ডিউটি আছে। বাবু অপেক্ষা করে' আছেন নিশ্চয়। আর তাঁর ছেলেরা মোটর না হ'লে তো এক পা-ও এগুতে পারবে না…আরে রাখো…মদন এক ঝটকা মার্‌লে হাতের,

আর, একটা ভিখারীকে ভূতলশায়ী করে' সোজা চলে' এল' বাড়ীর দিকে। আজ তার ছুটি। নিশ্চয় ছুটি। চুলোয় যাক্ বাবু, জাহান্নামে যাক্ ছেলেগুলো! কে কার মোটর চালায়? চালাবে না সে আজ! হ্যাঁ বাড়ীতেই ঢুকে পড়লো সে। ব্যস্, সে এখন ভাববে! শুধু ভাববে — ওরে ও গোখ্রো···একটু চা কর না···

* * *

প্রায় এক মাস কাটলো। মদন এখন ঝুলছে! হ্যাঁ সোজা সে শিকেয় ঝুলছে। কটা দিন বই তো নয়; তারপর মারো কাটারী! মদন প্রত্যেক দিন বিছানা থেকে ওঠবার সময়েই একবার করে' হাত দেখে ওঠে। দেখে বৃহস্পতির স্থানের ক্রস্‌টা বেশ পরিষ্কার হ'য়ে ফুটে উঠেছে কী না। কারণ টাকা পেতে গেলে ধন-রেখাটাই তো সব নয়। ওই বৃহস্পতির সংগেও যে ওর ষড় আছে। ধন হবে তারপর যশ হবে তারপর মান হবে। এতগুলো জিনিব একটা রেখায় কুলুবে কী করে'?

সে-দিন দুপুর-বেলা হঠাৎ আবার মদন চম্‌কে উঠলো। ডান করটা হঠাৎ অলক্ষিতে কখন তার নজরে পড়ে' গেছে। না, এ রেখা-গুলো তো আর অস্পষ্ট নেই।

মদন খানিকটা জলে হাত দু'টো কস্ কস্ করে' ধুয়ে নিলো। তারপর আবার চল্‌লো গবেষণা: এই বোধ হয় বুধের স্থান···এই বোধ হয় দেশভ্রমণের চিহ্ন...এই বোধ হয় সংগীত-বিত্মার রেখা আর এই বোধ হয় সন্তান-রেখা। আরে বাপরে বাপ! সব রেখার চাইতে যে সন্তান-রেখাই প্রবল দেখা যাচ্ছে! মদন দাগগুলো গুণ্‌তে লাগলো—এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট! আর নেই...? মোটে আটটা ..! ভগবান! তুমি এত কঠিন হয়ে'ও এত রসিক। হ্যাঁ, রসিক-ই তো!

তা না হলে' তোমার রাজ্যে ছাগলের দাড়ি হয়? বেড়ালের আবার গোঁফ হয়? ...আর মানুষ...তার কথা তো জানাই আছে! পোড়া-সোলমাছও হাত থেকে পালিয়ে যাচ্ছে! যাক্‌গে ছাই! মদন তিড়বিড়িয়ে উঠলো। আটটা সন্তানে আর ভয় কী? পয়সা থাকলে সে ধৃতরাষ্ট্র হতে'ও রাজী আছে।

চুলোয় যাক্‌গে—ওসব ভাবনা। ...মদন আবার ধন-রেখা মাপতে থাকে।

*　　　*　　　*

এর পর দিন-চারপাচ পরের কথা।

মদন তীরগতীতে চলেছে মোটর নিয়ে হাওড়া ষ্টেশনের দিকে।... খালি মোটর। বাবু কলকাতার বাইরে গেছেন। সন্ধ্যা ছ'টার গাড়ীতে আসবার কথা। মদন তাকে আন্‌তে চলেছে।

হঠাৎ ধর্মতলার কাছাকাছি এসেই মদনের খেয়াল হলো—তাই তো, কালকে যে খেলার কথা। এঁ্যাঃ! খেলার কথা! ...টাকা উঠবে?—ডারবীর?...তা হলে' সেই দালাল সাহেব আস্‌বে? বলবে—বেচে দাও টিকিট! আরে রামঃ, ছোঃ! প্রাণ গেলেও নয়! মদন ব্যাপারটা ভেবেই কেমন যেন ভীতু হয়ে' গেল। মাথাটা তার ঘুরে উঠলো।

আর, বাঁ-হাতে মোটরের ষ্টিয়ারিংটা চেপে ধরে' ঝট করে' ডান হাতটা মেলে ধরলো। যদি তার রেখার কিছু পরিবর্তন হয়।

কিন্তু নিমেষে যে এমন কাণ্ড হবে তা কে জানতো? মোটরটা টাল খেয়ে ঘুরে গেল এক লরীর মুখে—আর সংগে সংগে ধাক্কা!...আর দারুণ এক শব্দ!

...মোটর কী হল' কে জানে? কিন্তু সহসা মনে হল' মদনের

শরীরের হাড়-পাঁজরার ভিতর যেন কে ইলেকট্রিক চেপে ধরেছে।

যখন তার জ্ঞান হল' তখন সে চোখ চেয়ে দেখে এটা হাসপাতাল। হ্যাঁ, হাসপাতালই। ধীরে ধীরে অতীতকে স্মরণ করবার চেষ্টা করলো আর দেখলো তার গায়ে-হাতে দারুণ ব্যথা। বোধ হয় সমস্ত শরীরটা বাঁধা আছে বিছানার সংগে দড়ি দিয়ে।

…কিন্তু তার ডারবীর টাকা? দিনটা কী কেটে গেছে না কী? হঠাৎ সমস্ত রক্ত উত্তেজনায় যেন সর্বশরীরে কিল্‌বিল করে' উঠলো।… ·· কাকে জিজ্ঞেস্ করবে সে? মদন কাকে জিজ্ঞেস্ করবে? ও হ্যাঁ— হাতটা দেখবে। নিশ্চয় হাতের রেখাটা…

কিন্তু আশ্চর্য! ডান হাতটার দিকে যখন সে চাইল তখন দেখে এটা একেবারে কনুয়ের কাছে থেকে হয়ে' গেছে এম্‌পুটেট্‌।

২১—৫—৩৯

ইডেন গার্ডেন

বিকাল বেলাটার দিকে বেড়াতে গিয়ে অশোক ইডেন গার্ডেনের একটা বেঞ্চে ব'সে প'ড়লো। বেশীর ভাগ দিনই সে প্রায় আসে—একটু রোমান্সের সন্ধানে। রোমান্স মিলুক আর নাই মিলুক, দেখবার খোরাক তার অনেক মেলে। পুকুরের ওপারটায় একটা বেঞ্চে প্রায়ই এক প্রেমিক সোল্‌জার একটা বেওয়ারিস্ বর্ষীয়সীকে টেনে আনে। তাদের অনেক লীলা চলে। কখনো কখনো কোনো ভদ্রলোক পত্নীকে হাওয়া খাওয়াবার জন্য বেড়াতে আনেন। রান্না-ঘরের পত্নীর পায়ে বেখাপ্পা হিল-উঁচু জুতা বুঝি তার মুখে কান্না ফুটিয়ে তোলে। এ প্রহসনও সে দেখে, করুণা হয়। কখনো কখনো আসে বুক ফুলিয়ে দু'একটি যুবক, পাশে হয়ত দু'তিনটি তন্বী। তাদের পিছনে মৌমাছির মতো লাগে ছেলের দল। যেমন কর্ম তেমনি ফল।

তবে বেল পাক্‌লে কাকের কী, কথাটা সত্য। কতদিন আর ভালো লাগে এ সব দেখতে? অশোক পকেট থেকে কাগজ-পেন্সিল বার ক'রে কবিতা লিখতে সুরু করে।

কিন্তু তার জীবনেও একদিন বৈচিত্র্য এল'।

একটি তরুণী তার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। সুন্দরী এবং সপ্তদশী। ছোট নমস্কার ক'রে একটু হেসে বলে, মাফ করবেন...একটা কথা জিগ্যেস্ করতে পারি কী?

অশোক মুখ তুল্লে। স্বপ্ন-জগতে থেকে থেকে অনেক সময় সে বাস্তবকে ভুলে যেত'। তরুণী তার সাম্‌নে এসেছে মানসীর বেশে—এ যেন সে বিশ্বাস করতে পারলে না। চোখটা ভালো ক'রে চেয়ে একটু লজ্জায় বিব্রত হ'য়েই প্রশ্ন করলে, কী বল্লেন?

লজ্জা তার সাধারণতঃ আছে। মেয়েলী ধরণে কবিতা পড়ার দরুণ

বন্ধুরা তাকে নারী এবং লাজুক ব'লেই আখ্যা দিয়েছে। শুধু তাই নয়—আজকালকার মেয়েরা ছেলেদের দেখলে যতখানি না বিব্রত হ'য়ে পড়ে, সে মেয়েদের দেখে তার চেয়েও বেশী হয়; যদিও নারীর অংগ-প্রত্যংগ নিয়ে এই বাইশ বৎসরের মধ্যেই সে তিনখানা বই লিখে ফেলেছে; মানে—'পাশের বাড়ীর মেয়ে', 'ছাতের রোমান্স', আর 'চুলের গন্ধ'—এই তিনখানা।

তরুণী বল্লে, আপনাকে যেন আমার চেনা-চেনা লাগছে...আপনি কী অশোক মুখোপাধ্যায়?—তার কথায় বীণার ঝংকার।

চেনা লাগছে? অশোক সংকুচিত হ'য়ে উঠলো।—কৈ? সে তো তাকে চেনে না! সি-আই-ডি, টি-আই-ডি নয় তো? বল্লে, হ্যাঁ, আমিই অশোক মুখোপাধ্যায়, কিন্তু...

তরুণী কথাটা লুফে নিয়ে বল্লে, হ্যাঁ আপনি আমায় চিনতে পারবেন না, কিন্তু আমি আপনাকে চিনি···আপনার লেখার আমি খুব ভক্ত—তরুণীর মুখে জোনাকীর আলোর মতো হাসি।

বটে! অশোকের বুকের মধ্যে বসন্তের শিহরণ জাগলো।—তা হ'লে তরুণীরাও তার লেখা পড়ে! একটু লজ্জাটা চেপে রেখে অশোক ব'লে উঠলো—বসুন না এখানে, আমি দাঁড়াচ্ছি। অশোক সত্যই দাঁড়িয়ে উঠলো।

—ওমা, উঠছেন কেন? উঠছেন কেন? তরুণী মুখে রুমাল চাপা দিয়ে খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো।—আমি আপনার পাশে বসলেই বা এমন দোষটা কী? জানেন, আপনার লেখা প'ড়ে আমার মনের জড়তা সব নষ্ট ক'রে ফেলেছি। আপনার "পাশের বাড়ীর মেয়ের" জন্য অভিনন্দন দিতে ইচ্ছা করে। আপনার প্রগতি-যুগের

অপরাজেয় কবিতার সংগে আমারও সুর মিলিয়ে ব'ল্‌তে ইচ্ছে করে :

এসো তরুণীরা তরুণের পাশে,
যৌবনে শুধু জোয়ার যে আসে—
দু'দিনের......

কী চমৎকার! সত্যই তো!...কেন মেয়েরা বারান্দায় দাঁড়াবে? কেন তারা বাপ-মার ভয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম ক'র্‌বে? ভেংগে দাও জানালা, ভেংগে দাও কপাট, যার যা ইচ্ছে লোপাট করুক...সাহস বাড়ুক। মর্‌চে-ধরা মন নিয়ে বুড়োরা বাঁচতে পারে, কিন্তু তরুণ-তরুণীরা বাঁচবে না।—এক সংগে এতগুলো কথা ব'লে তরুণী যেন কিঞ্চিৎ হাঁপিয়ে উঠলো। তারপর দ্বিধাহীন চিত্তে বেঞ্চে ব'সে পড়ে' অশোকের একটা হাত ধ'রে আস্তে আস্তে টান দিয়ে বল্লে—বসুন, বসুন।

অশোকের শিরা-উপশিরায় বিদ্যুৎ খেলে গেল।...

একটু সংকুচিত হ'য়ে বস্‌লে। কিন্তু তার বুকটা তখন ফুলে উঠেছে আনন্দে...গর্বে। হায়! বাংলা দেশ! এ সব বইয়েরও তোমরা আদর দিতে শেখো নি! সেই হেমেন রায়, কেদার বাঁড়ুয্যে, দিলীপ রায়, নরেশ সেনগুপ্ত, বিভূতি বাঁড়ুয্যে প্রভৃতি অকাল-পক্ক লেখকদের ট্র্যাস বইগুলো নিয়ে মেতে আছ! পাঁচ ঠাকুরে মিলে লেখককে কুকুর বানিয়ে তুললে। কিন্তু একটি তরুণী—সে......

অশোক উচ্ছ্বাস দমন ক'রে বল্লে, কিন্তু কেমন ক'রে আমায় চিন্‌লেন—সে তো বল্লেন না।

—আপনাকে নাকী চিন্‌তে আমার দেরী লাগে? "ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ!"...রত্ন কারো অনুসন্ধান করে না, রত্নকেই সকলে

খোঁজে, জানেন তো? তা ছাড়া রামা-শ্যামা-যদুকে চিন্‌তে গেলে কষ্ট লাগে বটে, কিন্তু নলিনী সরকার, ফজলুল হক প্রভৃতি দেশ-মান্যদের দেখলেই চেনা যায়। কারণ এঁরা হচ্চেন মহা গুণী মহাজন! এঁদের ফটো বেরোয় কাগজে কাগজে, বাণী ঘোরে মগজে মগজে।

অশোক হাস্‌লে।—বটে! তা হ'লে আপনি ফটো দেখেই আমায় চিনেছেন বলুন?

—চেনবার শক্তিটা মেয়েদের প্রখর।—তরুণী অকারণে হাওয়ায় দোলা লতার মতো হেসে উঠলো।

কথা কইতে কইতে অশোকের লজ্জাটা ক্রমশঃ কেটে আস্‌ছিল। বল্লে, কিছু যদি না মনে করেন...একটা কথা জিগ্যেস কর্‌তে পারি?

—অবশ্য এবং বিলক্ষণ। কারণ আপনার কাছে আমি শিষ্যত্ব গ্রহণ কর্‌লাম—আপনি হবেন আমার নবদ্বীপের গুরুদেব।

অশোক হাস্‌তে যাচ্ছিল। তরুণী বাধা দিলে। বল্লে, 'ডোণ্ট টেক্ ইট লাইট্‌লি'—সংসারটাকেও দ্বীপ বলা যায়!

—হাঁ, তা বটে...আপনার নাম কী?

—এই কথা! আমার নাম হ'চ্চে ঝর্ণা রায়; ঝর্ণার আগে মিস্ বা কুমারীও দিতে পারেন; কারণ কুমারীত্ব এখনো যখন সিঁথির সিঁদুরে লোপ পায় নি।

ঝর্ণা! বেশ নামটা! অশোক প্রশ্ন কর্‌লে, আপনি কবিতা লেখেন?

—না, আমি কবিতা বুঝি কিন্তু লিখি না,...ওই খানেই আমার বিশেষত্ব। কারণ আমাদের দেশে মেয়ে-পুরুষ যদি একশো জন শিক্ষিত হয়, তবে হিসাব করে' দেখেছি আটানব্বই জন কবিতা লেখে। আর

সামান্য এক সাপ্তাহিক পত্রিকাতেও কম ক'রে প্রত্যেক দিন কবিতা আসে অন্ততঃ আশীর উপর। সে স্থানে কবিতা না লেখাই ভালো, আর সম্পাদকের পায়ে তেল খরচ করাও অধর্ম। অবশ্য আপনার সম্বন্ধে যে কিছু বলছি—তা মনে ক'র্বেন না।—ঝর্ণা হাস্‌লে। সামান্য কারণেও তার গালে গোলাপ ফুটলো।...

অশোক তা' জান্‌তো। কারণ তারও একদিন গেছে। কিন্তু নিজের টাকা ছিল ব'লেই টপ টপ ক'রে তিনখানা বই ছাপিয়ে ফেলেছে। বল্লে, তাই ব'লে নিজে লিখতে পার্‌লে পাঁচ জনের প্রতি চাইবার দরকার কী? আর তা' ছাড়া আপনি তো মেয়েছেলে; আপনার নাম দেখলেই তো সম্পাদক ত্রাহি মধুসূদন!

কথাটা অবশ্য সত্য। ঝর্ণা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে—কিন্তু সে সুযোগও সম্পাদকদের দিতে যাব কী জন্য? আর তা' ছাড়া মেয়েরা কবি হ'য়ে কী কর্‌বে? একে তো চাকরী পেয়ে পুরুষদের বেকার সমস্যা বাড়িয়ে তুলেছে, তার উপর কবি হ'লে তো...

—চাকরীর ক্ষেত্রে ও হ'তে পারে, কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রে মোটেই চল্‌বে না। কারণ চাকরীর সংগে সম্বন্ধ আছে পয়সার কিন্তু সাহিত্যের সংগে...অশোক বুড়ো আংউল দেখালে। ঝর্ণা হাস্‌লো।

রুমাল দিয়ে আলগোছে কপালের মুক্তার মতো ঘামগুলো মুছতে মুছতে ব'ল্লে, কিন্তু যাই বলুন, কবিতা তো অনেকে লেখে, কিন্তু আপনার কবিতার বৈশিষ্ট্য আছে; ভেন্‌চার আছে···আমি খুব প্রসংশা করি। ঠিক এমনি ধারাই লিখতে হবে—যার কাছে বাংলা দেশের নিরানব্বই জন কবি পরাস্ত হয়।

অশোক নিজের কবিতার প্রসংশা শুনে আর একটু গর্বিত হ'য়ে উঠলো।

ঝর্ণা দাঁড়ালো।

কী, চল্‌লেন না কী? অশোক ব'ল্লে।

—না, যাব কেন? অন্য এক জায়গার বসি আসুন;···দেখছেন না কতকগুলো ছোকরা কটাশের মতো কী রকম চেয়ে আছে আমাদের পানে?

ঠিক কথা·· ইডিয়ট! অশোক উঠলো।

অন্য একটা ঝোপ বেছে নিয়ে তারা বস্‌লো। ঝর্ণা অশোকের গায়ের একান্ত সন্নিকটে···তার মাথার চুলের গন্ধ এবং আঁচলের স্পর্শ অশোককে বুঝি পাগল ক'রে তোলে।

অশোক বল্লে, আপনি একলা এসেছেন?

—তা' নয় তো কী? দোকলা এখন পাই কোথা?

—আপনার বাড়ীতে কে কে আছে? অশোক প্রশ্ন কর্‌লে খুব সরল ভাবেই।

—সে অনেক!...খালি মা আর আমি। বাবা শিলং'এ থাকেন... দাদা-টাদার বালাই নেই।

ঝর্ণা প্রশ্ন কর্‌লে, আপনি কোথায় থাকেন এখন?

অশোক বল্লে, উপস্থিত মেসে আছি। বাবা টাকা পাঠান দেশ থেকে। কোনো রকমে কলেজে পড়ার নাম ক'রে সাহিত্য-চর্চা করি।

হাতের দামী রিষ্ট-ওয়াচটার দিকে অশোক চেয়ে দেখলে—সাড়ে ছ'টা বাজে।

তারপর অনেক কথা-বার্তা হ'ল।·····

হঠাৎ ঝর্ণা অশোকের একখানা হাত কোলের উপর তুলে নিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে যেয়ে বল্লে, একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস ক'রবো, উত্তর কিন্তু ঠিক দিতে হবে···আচ্ছা, পাশের বাড়ীর মেয়েকে কী সত্যই আপনি ভালোবাসেন ?

ভালো লাগা আর ভালোবাসার মধ্যে তফাৎ আছে। তবে যৌবনে দু'টো অনেক সময় মনের কাছে এক হ'য়ে যায়। যাকে যার ভালো লাগে, তাকেই সে ভালোবাসে। কথাটা একটু ভাববার বিষয়। অশোক বল্লে, ভালো হয়তো কাউকে বাসিনি, কিন্তু ভালো অনেককেই বোধ হয় লেগেছে।...তার তখন বুকে উদ্দাম পূর্বরাগের ঝড়।

ঝর্ণা হঠাৎ ফেনায়িত নদীর মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে' উঠলো। অশোকের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বল্লে, কিন্তু আমায় আপনার পছন্দ হয় না ? ধরুণ, আমিই যদি অপনাকে ভালোবাসি !

অশোক আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলে না। মুহূর্তের উত্তেজনায়·········

ঘণ্টা দেড়েক কেটে গেল।

অন্ধকারের বুক চিরে রূপোলী জ্যোৎস্নার জোয়ার এসেছে বাগানে।

ঝর্ণা বল্লে, এবার উঠবো·· এইখানেই আবার মিট করবো কাল এসে, হাঁ, আপনার টাইমটা দেখুন তো···

টাইম দেখা হল'। অশোক বল্লে, আটটা।

—আটটা ! ওরে বাপরে ! ঝর্ণা দাঁড়িয়ে উঠে যেন আর্তনাদ ক'রে উঠলো—ওঃ, মহা মুস্কীলে পড়লাম তো !···তার মুখে উৎকণ্ঠার ছায়া।

অশোক চিন্তিত হল'।—মুস্কীলটা কী, সেটা আমায় বলুন না··· হয় তো সাহায্য করতে পারি।

সাহায্য! ঝর্ণা অশোকের পানে চাইলে।—কিন্তু সে তো আপনার দ্বারা সম্ভব হবে না। মুস্কীলটা হচ্চে যে—আমার আজ নিমন্ত্রণ ছিল একটী মেয়ের বাড়ী। সে আমার বন্ধু। আটটায় যাওয়ার কথা কিন্তু এখন দেখছি যাওয়া আর হ'য়ে উঠলো না।

তার চোখে যেন বিষণ্ণ-কাতর দৃষ্টি!

—কেন? কেন? এখনি যান না…দু'মিনিট লেটে গেলে ক্ষতি কী?… বাধাটা কিসের?

—শুভ কাজে বাধা অনেক; যেতে গেলে সর্বপ্রথম আমায় এখনি বাড়ী যেতে হয়। সেখানে শাড়ী-টাড়ী বদ্‌লে কিছু টাকা ও হাত-ঘড়িটা সংগে নিতে হয়। কারণ টাইম ও টাকা ওসব স্থানে বড় দরকারী।… এখন দেখছি আমার সব মনেই ছিল না, বড্ড ভুলো মন আমার, অশোক বাবু!

—কিন্তু আপনি যদি কিছু না মনে করেন, ঝর্ণা দেবী—অশোক বল্লে, তা হ'লে বলতে অনুমতি চাই যে, শুধু আজকের জন্য আমার এ রিষ্ট ওয়াচটা আর কিছু টাকা নিয়ে যান। আর শাড়ী-টাড়ী নাই বা বদ্‌লালেন!…এমনিতেই তো আপনি মহীয়সী রাণী। যার রূপ আছে, তার আবার অন্য জিনিষে দরকার কী?

ঝর্ণা ফিক ক'রে হেসে ফেল্লে। —মান্‌লাম এবং আপনি যে আমায় এত অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লেন, তার জন্যও ধন্যবাদ। কিন্তু আমি যদি ওগুলো নিয়ে হঠাৎ সাফ হ'য়ে যাই, তখন আপনি কী কর্‌বেন?

—অন্ততঃ সে রকম সন্দেহ তো আমি করি না; আর যদি তাই হয়, তবে জীবনে একটা বড় অভিজ্ঞতা লাভ কর্‌বো। মানুষ অভিজ্ঞতা

লাভের জন্য তো কতো কী-ই না কচ্ছে ;—আফ্রিকার বনে বনে, হিমালয়ের পর্বত-চূড়ায়, বিদেশে বিধর্মীর মাঝখানেও ছুটছে। আমি না হয় এম্‌নিতেই লাভ কর্‌বো।

— কথাটা বলা সহজ, কিন্তু 'প্র্যাক্‌টিক্যাল' হ'য়ে ওঠা শক্ত।...যাক্‌, কত টাকা আছে আপনার কাছে শুনি?

—তা প্রায় তিরিশ টাকা।

দিন—অম্লান বদনে ঝর্ণা চেয়ে নিলে এবং ঘড়িটা শুদ্ধও নিলে।

তারপর হ্যাণ্ডশেকের কায়দায় অশোকের হাতটা একটু নাড়া দিয়ে বল্লে, আবার কাল এখানে দেখা হবে।.. যথেষ্ট ধন্যবাদ আপনার উদারতার জন্য।...

পরের দিন বিকাল হ'তেই আবার অশোক বেড়াতে বেরোল'। রাত্রিতে তার ঘুম হয় নি। একটি মেয়ে তাকে ভালোবেসেছে... আলিংগন দিয়েছে—এটা তার জীবনের নূতন অধ্যায়ের মতো...ঝড়ের শেষে প্রশান্ত সাগরের মতো। দরকার কী আজ তার চাইবার জানালার দিকে, বারান্দার পানে? উঞ্ছবৃত্তি মানুষ ততদিনই করে, যতদিন সে তাকে অতিক্রম কর্‌তে পারে না। কিন্তু আজ সে পেয়েছে পথ... গোলাপের গন্ধ...কবিতার ছন্দ। জগতকে দেখবে সে এক জনের মধ্যে...নিখিল নারী-কুলকে পাবে তার দয়িতার বুকের তট-রেখায়। পথের প্রেমই আস্‌বে ঘরের প্রেমে...অসীম আজ ধরা দেবে সসীমে।

সে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে বস্‌লো। অস্তমান সূর্য তখন পশ্চিম গগন রাংগিয়ে বিদায় নিচ্ছে। তার লাল এবং হলদে আভা গাছের ফাঁকে ফাঁকে স্বপ্ন রচনা করেছে।......

খানিকটা পরেই ঝর্ণার উদয় হল'।

গোধূলির আকাশ থেকে যেন সে নেমে আস্‌ছে।...আলোয় এবং রূপে যেন সে ঝল্‌মল্‌ কচ্চে।...

আসুন - অশোক অভ্যর্থনা করলে।

—কিন্তু দেখুন, ঝর্ণা মুখখানা ম্লান করে' কাঁদু-কাঁদু ভাবে বল্লে,—বড্ড ভুলে গেছি। আপনার টাকা ও ঘড়ির কথা আমার মনেই ছিল না। এই মাঠে আস্‌তে আস্‌তে মনে পড়লো। এখন উপায়?... আমার কাছে তো মোটে দশটা টাকা আছে!

—তাতে আর কী হয়েছে?...পরে দিয়ে দেবেন এখন···তার জন্য আমি মোটেই উৎকণ্ঠিত হই নি। চলুন, বসা যাক্‌ একটা জায়গা বেছে নিয়ে।—অশোক হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে।

—তার চেয়ে চলুন না আমাদের বাড়ী আজ···সেখানে পিয়ানো-টিয়ানো বাজানো যাবে, আপনার বেড়ানোও হবে আর আমার···

—বাড়ী? প্রস্তাবটা খুবই ভাল। কিন্তু আজ আর নয়, কাল না হয় যাবো,—অশোক বল্লে,—কী বলেন?

—তা, তাই না হয় হবে, কিন্তু কাল যাওয়া চাই অবশ্য অবশ্য। আপনাকে ঠিকানা দিচ্চি। না গেলে কিন্তু ভালো হবে না বলে' দিচ্চি··· আপনার কলেজে গিয়ে হানা দেবো তা হলে'!

—না, কথা রাখতে সমর্থ হবো বলে' মনে করি।—অশোক বল্লে।

—আচ্ছা, Addressটা এই···ঝর্ণা ঝর্ণা-কলম দিয়ে এক ফোঁটা কাগজে লিখে দিলে—৪৮।৮ ল্যানস্‌ডাউন রোড।...

তারপর বসা হল'। কিন্তু মিনিট পাঁচেক পরেই ঝর্ণা বল্লে, না, আলসের মতো বসে' থাকতে পাচ্চি না আজ। চলুন, বালিগঞ্জে যাওয়া যাক্‌।

অশোক বল্লে,...সেকেণ্ড ইট!

...একটা মোটর ডেকে দু'জনেই চল্‌লো লেকে। রাত আটটা পর্যন্ত সেখানে ঘোরা হ'ল'। অনেক কথা-বার্তা...অনেক কিছু হ'ল'।

ঝর্ণা একটু অন্ধকারে গিয়ে বল্লে, শুনুন!

অশোক তার পাশে এল'। ঝর্ণা চাঁপার মতো আংউল থেকে তার আংটীটা খুলে অশোকের আংউলে পরিয়ে দিলে, অশোকেরটা ও নিজে পরলে। তারপর মুখের একান্ত সন্নিকটে নিজের পরীর মতো মুখখানা বাড়িয়ে বল্লে, এটা মনে রাখবেন...আমাদের ভালোবাসার 'সিম্বল'; যখন কেউ খুলে ফেলবে জানবো, তখন বুঝবো প্রেমের বন্ধনে শৈথিল্য ধরেছে ..আর কিছু বলবার আছে আপনার?

অশোকের আত্মা তখন স্বর্গে। নন্দন-কাননের উর্বশীকে স্বপ্নে দেখছে। কোনো কিছু না বলে' শুধু একটা...

পরের দিন বিকাল না হ'তেই অশোক কলতলায় সাবানের গন্ধ ছুটিয়ে দিলে। মেসের চাকরকে ব্যতিব্যস্ত করে' তুল্‌লে ...এই, কাপড়টা ডাইংক্লিনিং থেকে নিয়ে আয়...ওরে বাসু, তোর মাইনে কাটবো দাঁড়া...ওহে, বাল্‌তিটা এখন নিয়ো না, চোখে সাবান দিয়েছি...আঃ! গায়ে জল ঢাল্‌তে দেবে না?...ওরে, আমার জুতোটা গেল কোথায়?... তাই তো, পাঞ্জাবীটা কেউ নিলে না ত'? ইত্যাদি ইত্যাদি।

মেসের বন্ধুরা তার এই ভাবাতিশয্য আবিষ্কারে সকলেই উদ্‌ব্যস্ত।— ব্যাপার কী অশোক?

বাজে বোকো না, যাও;—অশোক সকলকে এড়িয়ে গেল।

সাজগোজ করে' রাস্তায় বেরিয়ে বর্মা চুরুট কিন্‌লে। আজ সে সিগারেট খাবে না। সিগারেট আবার বড় বড় লোকে খায় না কী?

ব্যারিষ্টার, অধ্যাপক, শৈলজানন্দ, অচিন্ত্য সকলকেই তো সে বর্মা টান্‌তে দেখেছে। অতএব সে-ও টানবে ;...একটা ধরালে। তারপর চলমান একটি ট্যাক্সি ডাক্‌লো। চড়ে' বল্লে,—চল', ল্যান্‌স্‌ডাউন...

৪৮।৮ বাড়ী মিল্‌লো। বেশ বড় বাড়ী, সাম্‌নে দরোয়ান বসে' আছে। হ্যাঁ, ঝর্ণা এই বাড়ীতেই থাকে। গাড়ীর ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে সে গেটের মধ্যে ঢুকে পড়লো। দরোয়ান এসে সেলাম দিলে, বৈঠক-খানার ঘর খুলে বসতে বল্লে।

প্রায় পনের মিনিট কেটে গেল— কেউ নামে না। নিচেটা নিস্তব্ধ ; অশোক অস্থিরতা অনুভব করতে লাগলো। একটা বড় আরসীর দিকে সে চাইলে। হ্যাঁ—গোঁফটা ঠিক আছে। এবার সে আর একটা চুরুট ধরালে।

খানিকটা পরেই একটি তেইশ-চব্বিশ বৎসরের যুবতী নেমে এলেন। চোখে তাঁর চশমা, মাথা থেকে ঝুল্‌ছে সাপের মতো দুটো বেণী।... অশোক ঝর্ণা মনে করে' দাঁড়াতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাঁকে দেখেই বসে' পড়লো।

যুবতী এসে বল্লেন,—অগ্রিম টাকাটা এনেছেন কী ?

অগ্রিম টাকা ? অশোক আকাশ থেকে পড়লো। বল্লে, কিসের টাকা ?

যুবতী এবার ঝাঁঝালো স্বরে ব'লে উঠলেন, জানেন না ?···বেড়ে ব্যবসা তো ফেঁদেছেন আপনারা ? বলি, বইখানা না হয় প্রকাশ করতেই দিয়েছি কিন্তু এভাবে আপনারা চুরি লাগাবেন, তা কে জান্‌তো ? ...না, আপনাদের ছাড়া হবে না···চিটিং কেশ করতে হ'ল দেখছি তো !

অশোক মরিয়া হ'য়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, আপনি কী

ব'ল্‌ছেন আমি তা ভালো বুঝতে পাচ্ছি না—তবে মোটের উপর যা অনুমান কচ্চি, তাই থেকে বল্‌তে পারি—আমি পাব্লিশার বা ও লাইনের কোনো লোক নই। আমি চাই ঝর্ণা রায়কে।

—ঝর্ণা রায়! সে তো আমি! যুবতী বল্লেন,—মাফ করবেন, আমি ভুল বুঝে ছিলাম, কিন্তু কী প্রয়োজন?

আপনি? অশোক অতি-মাত্রায় বিস্মিত হ'য়ে চেয়ে রইল। বোধ হয় রবীন্দ্রনাথকে এই সময় দাড়িহীন অবস্থায় দেখলেও সে ততখানি আশ্চর্য হ'ত না।

যুবতী বল্লে, আমি যে অন্য কেউ এমন সন্দেহ আপনার হচ্ছে না কী?

—তা···না···হ্যাঁ—অশোকের মুখ থেকে ভালো ক'রে কথা বেরোলো না।

যুবতী কপাল কুঁচকে হাস্‌লেন—কী দরকার বলুন?

—না, কোনো দরকার নেই...আমি চল্‌লাম; অশোক পা বাড়ালে।

নূতন ঝর্ণা রায় অশোকের 'গেস্‌চার পস্‌চার' দেখে তো অবাক! বোধ হয় ভাবলেন—এ পাগল কিংবা...

প্রশ্ন করলেন,—আমার লেখার কী তারিফ করতে এসেছেন? না, কোনো কাগজের জন্য··?

অশোকের হাত থেকে আগেই চুরুটটা মেঝেয় প'ড়ে গেছলো, এবার সে কাঁপতে আরম্ভ ক'রলে।···তার মুখে বাষ্পের মতো ঘাম।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পাশের ঘরে ফোনের কিড়িং কিড়িং শব্দ উঠলো।

নূতন ঝর্ণা রায় বল্লেন, আপনি···আমি এক্ষনি আস্‌ছি···আপনার কথা না শুনে ছাড়বো না। বলে'ই অদৃশ্য হ'লেন।

ইতিমধ্যে অশোক ও চোরের মতো······

পরের দিন আংটীটার দিকে চেয়ে দেখে—সেটা গিল্‌টির।...তার পাগল হ'য়ে যাবার মতো অবস্থা হ'ল'। অশোকের নিজের পোখরাজের আংটীটার দাম ছিল কম করে'ও ৭৭৲ টাকা. আর আশী টাকার ঘড়ি, প্লাস ত্রিশ টাকা...। এখন উপায়? কী ঠকানই ঠকিয়েছে! ঘর নেই, বাড়ী নেই—এমন একটা অজ্ঞাতকুলশীলা মেয়েকে কেন সে বিশ্বাস করতে গেল? জীবনে বড় অভিজ্ঞতা সে লাভ করবে বলেছিলো—এখন হয়েছে তো?

মণিহারা সাপের মতো সে রাস্তা-ঘাট মাঠ-ময়দান মাস ছয়েক ধরে' চষে' ফেল্লে। যতো মেয়ে প্রজাপতির মতো ডানা মেলে চলে' যায়, তাদেরি পিছন নেয়। কিন্তু জন-সমুদ্রে ঝর্ণার আর দেখা নেই।······

তার কবিতার মোড় ঘুর্‌লো। সে এবার সত্যই নারী-বিদ্বেষী... স্ত্রীওবার্গ! আস্‌ছে বছর তার দু'খানা বই বেরুচ্চে—নাম হ'চ্চে, 'তুখোড় মেয়ে' আর 'ইডেন গার্ডেনের ট্রাজিডি'। প্রত্যেকখানার দাম হবে দু'টাকা। কবিতার বই তো আর বাংলাদেশে বেশী বিক্রী হয় না! তা, দু'টাকায় য' টা লাইব্রেরী কেনে তটাই সই।

—১৯৩৭

নেতার মৃত্যু

দেশের এক বিখ্যাত নেতা মারা গেলেন।

মারা গেলেন জেলে পচে' অনশন করে'। আর কী ভাগ্যি, এই মৃত্যুটা তাঁর বাইরে না হয়ে' জেলে হ'লো বলে'ই দেশের আপামর সকলে উঠলো ক্ষেপে। হ্যাঁ, দুঃখে, ক্ষোভে আর অপমানে উঠলো ক্ষেপে।

বিকালে বেরুলো টেলিগ্রাম। এত বড় খবরও হেঁকে ঘোষণা করতে পারলো না হকাররা। কারণ খবরকে রংদার করে' খবরের কাগজ বিক্রী করবার স্বাধীনতা খবরের কাগজ বিক্রেতাদের চলে' গেছে। খালি ছুটছে হকাররা। যার সাইকেল আছে, সে সাইকেলে; আর যার তা নেই, সে পায়ে।

কিনলাম না টেলিগ্রাম। ও জিনিষ সকলকেই কিনতে হবে এর মানে নেই। রাস্তায় এক ভদ্রলোক পড়ছিলেন হাতে করে'; আর সেখানে ভীড় করেছে প্রায় আট দশ জন লোক। আমিও হুমড়ী খেয়ে অনধিকার প্রবেশ করলাম, আর বেশ গায়ে জোর এনে স্থির হয়ে' দাঁড়ালাম। চশমাটা চোখে লাগিয়ে পড়ে' নিলাম বিনা পয়সায় খবরটা। দেখি এক জায়গায় লেখা আছে—মৃত নেতার শব নিয়ে কলকাতা প্রদক্ষিণ করা হবে।

কল্য সন্ধ্যায় কেওড়াতলার ঘাটে বিখ্যাত নেতা অতীশ সেনের শব-দাহ হবে।

বড় দুঃখের কথা সন্দেহ নেই। পরদিন সকালে উঠে শবানুগমন করলাম। বিরাট শোভাযাত্রা! ফুলের ছড়াছড়ি। বড় বড় মালা জড়ানো হয়েছে শবের উপর, আর ধূপ, ধুনো, গুগ্‌গুলের গন্ধ···! এ রকম ব্যাপার জীবনে দুটো বই বেশী দেখেছি বলে' মনে হয় না।

বন্দেমাতরম থেকে সুরু করে' যেখানে যত প্রকারের উত্তেজক

দেশভক্তি মূলক রব ছিলো সবই কানের মধ্যে পৌঁছতে লাগলো। আর সহসা এক ভদ্রলোকের কনুইয়ের গুঁতো আর চোখ রাংয়ানিও আমাকে বিদ্ধ করলো। ভদ্রলোক অন্যান্য লোকদের প্রতি চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—একে বার করে' দেওয়া হক' এই শোভাযাত্রার মধ্য থেকে। পায়ে জুতো, জুতো...

তাই তো! শোকের সময় জুতা যে পায়ে রাখতে নেই এটা মনেই ছিল না। ভীষণ অপরাধ স্খালনের ভংগীতে দিলাম নূতন জুতা-জোড়াটা পা থেকে ছেড়ে। তারপরই চেঁচিয়ে উঠলাম—জয় অতীশ সেন কী......

হ্যাঁ, এবার ভদ্রলোকেরা দলে টানলেন। এক ভদ্রলোক আমার কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁর গলা চেঁচানির আতিশয্যে বসে' গেছে। তবুও সেই ভাংগা গলা থেকে কী একটা স্বর বার করবার চেষ্টা ক'রতে লাগলেন। বুঝতে পারলাম না কী বলছেন। কিন্তু পাশের লোকের কথা বেশ কানে এলো। তিনি বলছেন, লোকটা মরে' গিয়েও শান্তি পায় নি। বেশ বোঝা যাচ্ছে ও মুখ মৃতের, কিন্তু তবুও দেখে আসুন দু'চোখের ধার দিয়ে কী রকম দু'-ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়েছে। আহা! দেশকে কী কম ভালোবাসতো অতীশ সেন!

সত্যই অতীশ সেন যে দেশকে কম ভালোবাসতেন না, তার প্রমাণ কী তীব্র ভাষাতেই না দিতে লাগলেন অন্যান্য নেতারা শ্মশানে গিয়ে। একজন নেতা বললেন, মরবার দু'দিন আগে আমি গেছলাম জেলে দেখা করতে ওনার সংগে, সে কী ভদ্রতা আর আন্তরিকতা! দেশের জন্য মানুষটা যে কী ভীষণই না ভাবতেন তা এক কথায় বলা যায় না। আমায় বললেন, দেখ নীরেন, আমাদের দেশ স্বাধীন হবে—

আবার স্বাধীন হবে, আমি স্বপ্ন দেখছি স্বাধীন প্রভাতের, যেদিন সূর্য উঠবে স্বাধীনতার রংয়ে রাংয়া হয়ে', শুধু আমি মুক্তি পেলে তুমি দেখবে···

কিন্তু ভদ্রলোক আর বলতে পারলেন না, হু হু করে' কেঁদে ফেললেন।

জানা হ'লো লোকটার নাম নীরেন।

তাঁকে কাঁদতে দেখে তাঁর অসম্পূর্ণ কথা সম্পূর্ণ করে' দেবার জন্য আর এক নেতা দাঁড়ালেন। আর ওজস্বিনী ভাষায় সে কী বক্তৃতা!

বললেন, দেশের জন্য যিনি এত করেছেন দেশ তাঁর জন্য কী করলো? আসুন, সকলে মিলে ভাইসব, আমরা চাঁদা তুলি আর এক স্মৃতি-সৌধ গড়ি অচিরেই, যাতে করে' আমাদের বংশ পরম্পরাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয়।

আর এক নেতা দাঁড়ালেন। বললেন, আপনারা যদি মানুষ হন, তাহলে' আজ্জি 'জন্মান্তর' পত্রিকাখানি বর্জন করুন। বহুদিন ধরে' ওটাকে বর্জন করতে বলা হয়েছে কিন্তু তার বদলে ওর চাহিদা আপনারা বাড়িয়ে তুলেছেন। কিন্তু আর নয়—আর নয়। মনে করে' দেখুন, সেদিনও পর্যন্ত কাগজখানা কী না বলেছে অতীশ সেনকে!···আজ অতীশ সেন উপবাস করে' মারা গেল কেন জানেন? সে আপনারা জানেন না। কিন্তু আমি জানি। অতীশ সেন বলেছেন—তাঁর অনশন বিদেশের উপর বিতৃষ্ণায় নয়। স্বদেশরই উপর। আর স্বদেশ তাঁকে আঘাত দেয় নি। দিয়েছে 'জন্মান্তর'।···সংগে সংগে ভীষণ হাততালি।

হাততালি পেয়ে বক্তা আরো উৎসাহিত হয়ে' উঠলেন। এবং

যদিও বসতেন মিনিট দু'-এক'এর মধ্যে কিন্তু সে আশাও আর রইলো না। চোখ রাংয়িয়ে বলে' উঠলেন, যদি আপনাদের আত্ম-সম্মান জ্ঞান থাকে তা'হলে' এই রাত্রেই চলুন 'জন্মান্তর' অফিস ভাংতে। এখনো আপনারা ঘুমিয়ে আছেন?

* * *

পরদিন সকালে উঠে দেখি পাড়ায় পাড়ায় ভীড়। বুঝলাম—রবিবার। চায়ের দোকানে গিয়ে দেখি মারামারি চলেছে। অনেকেই প্রমাণ করতে চায়, অতীশ সেনের সংগে তাদের বন্ধুত্ব ছিল। এক ভদ্রলোক পকেট থেকে বার করেছেন একটা ফটো। তার মধ্যে পাশা-পাশি তিনি আর অতীশ সেন বসে' আছেন। ভদ্রলোক বলতে চান—অতীশ সেনও তুচ্ছ ছিলেন না আর তিনিও নন। এতই দয়ালু ছিলেন অতীশ সেন যে একদিন দেখা গেল একটা খোঁড়া পার হ'তে পারছে না একটা বড় রাস্তা। স্বয়ং অতীশ সেন তাকে বুকে ধরে' পার করে' দিলেন আর খুলে দিলেন গায়ের জামাটা। বল্লেন, পরো। সে সব তাঁর নিজের চোখে দেখা।…তিনি কী যা তা লোক ছিলেন? একেবারে দেবতা।

সত্যই দেবতা। একমাস পরে একখানি মাসিকেও তাই দেখলাম। মাসিকটার নাম হচ্ছে—'দুর্বাসা'। মালিকরা বুদ্ধি করে' বার করেছেন অতীশ-সংখ্যা। কালো মলাট দিয়ে বাঁধানো। শোকের চিহ্ন। তার মধ্যে কী নেই ভেবে পেলাম না। অতীশ সেনের জন্মকাল থেকে সুরু করে' তাঁর চিতারোহণ পর্যন্ত সব কিছু ঘটনা বেশ বিশদ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পত্রিকাটির মধ্যে রাজ্যের ছবি। প্রথম যৌবনে অতীশ সেনকে কেমন দেখতে ছিলো, পরে তাঁকে কেমন দেখতে হলো, কারাগারে

অতীশ সেন, অনশনে অতীশ সেন, মৃত্যুশয্যায় অতীশ সেন প্রভৃতি নানান পোজের ফটো আর ছবির ছড়াছড়ি। এবং শুধু তাই নয়, যাঁরা তাঁকে ভিত্তি করে' প্রবন্ধ বা কবিতা লিখেছেন, সেই সব লেখকদের পর্যন্ত ছবি ছাপা হয়েছে কাগজে। আর বিশেষ আশ্চর্যের কথা, আমাদের পাড়ার হেবো – যার লেখা অবতার পর্যন্ত ছাপতে রাজী হয় নি, তারও একটা সুবৃহৎ প্রবন্ধ আর ফটো ছাপা হয়েছে কাগজে। হেবো লিখেছে, অতীশ সেন না কী কোথাকার রাজাকে মারতে গেছলেন!…কেউ জানে না যা—এমন সব চমকপ্রদ ঘটনা ও সে প্রকাশ করেছে। পড়ে' স্মরণ হল'—এই হেবো-ই শরৎ বাবুর মৃত্যুর পর একটা মফঃসলের কাগজে লিখেছিলো যে তিনি না কী হেবোকে এত ভালোবাসতেন যে একদিন একশো টাকার একটা নোট উপহার দিয়েছিলেন। অবশ্য জীবিত কালে তার সংগে শরৎ বাবুর কোনো দিন আলাপ ছিল বলে' মনে হয় না। কিন্তু যাই হক', হেবোকেও লেখক মূর্তিতে দেখলাম। আর এক ভদ্রলোকের লেখা পড়লাম। তিনি লিখেছেন, তাঁর 'বস্তির গল্প' ও 'গলিতে গোলমাল' বই দু'খানা পড়ে' অতীশ সেন না কী এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁকে এক দীর্ঘ প্রশংসাপত্রও দিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়—সেই আসল প্রশংসাপত্র তিনি আজ কাউকে দেখাতে পারবেন না। কারণ সেখানি কে যে চুরি করে' নিয়েছে বা পকেট-মারে সরিয়েছে সে খবর তাঁর অজ্ঞাত। তবে তাই থেকে কপি করা হয়েছে যে কাগজে সেটা অবশ্যই আছে তাঁর কাছে।

যাক, অনেক ভদ্রলোকের অনেক লেখা পড়লাম।…

এবার দিন পাঁচ পরে শুনতে গেলাম যুবকদের এক মিটিং।

এলবার্ট হল।

একটী তেইশ বৎসরের তরুণীর গানের পর শোক-সভা স্থরু হল'। মদনানন্দ মহারাজ দাঁড়িয়ে উঠলেন। কী বক্তৃতার তোড়! বোধ হয় চৌচির হবে বাড়ীখানা। নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে' শুনতে লাগলাম।... মদনানন্দ মহারাজ ইংরাজকে গালাগালি দিলেন, সরকারকে ধিক্কার দিলেন। কেউ জানে না যে সব খবর তাই তিনি অবিশ্রান্ত বলে' গিয়ে জনসভাকে মুগ্ধ, বিস্মিত এবং উত্তেজিত করে' তুললেন।

পরেই দাঁড়ালো একটী যুবক। বল্লে, ভাইসব! আপনারা জানেন অতীশ সেন কী রকম মানুষ ছিলেন? তিনি ভিটে-মাটি পর্যন্ত বিক্রী করে' বাংলার এক অভাগা দারিদ্রপীড়িত জনৈক যুবকের জীবনকে গড়ে' তুলে ছিলেন। সে যুবক আমার পরিচিত, আপনাদেরও পরিচিত। তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ আক্তার উদ্দীন। কিন্তু দুঃখ হয় বল্‌তে, তাঁরি শিক্ষায় এবং দীক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে' যে একদিন চট্টগ্রাম লুণ্ঠনের মামলায় ধরা পড়ে' রাজাকে পর্যন্ত রক্তচক্ষু প্রদর্শন করলে, সেও আজ বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে সাক্ষ্য দিত—হ্যাঁ সাক্ষ্য দিত এবং জোর গলায় বলতো, অতীশ সেন কী শ্রেণীর মানুষ ছিলেন।

পরবর্তী বক্তাও দাঁড়িয়ে ভীষণ সব কথা শুনালেন। এবং তার পরবর্তী বক্তা যে দাঁড়ালো, তাকে দেখে আমি অবাক হলাম। দাঁড়ালো আমাদের পাড়ার উপেন, যার বক্তৃতা দিয়ে নাম কেনবার সখ ছিলো জন্মগত। তারও বক্তৃতা শুনলাম। তার চোখে জল দেখে আমার চোখেও জল এলো। সর্বশেষে সে বললে—অতীশ সেনের জীবনের গূঢ় ইতিহাস একদিনে প্রকাশ পাবার নয়; এমন অনেক—অনেকদিন

ধরে' এমন সব জিনিষ তাঁর মহান চরিত্রের ভিতর থেকে আবিষ্কৃত হবে যা দেখে মানুষের চোখ ঝল্‌সে যাবেই যাবে।

সভা রাত্রি সাড়ে আটটায় ভংগ হল'। নীরবে বাড়ী চলে' এলাম। কিন্তু উপেনের কথাটাই মনে পড়লো। অতীশ সেনের জীবনের গূঢ় ইতিহাস একদিনে প্রকাশ পাবার নয়। কথাটা হয়তো ঠিক। যত দিন যাবে এর ব্যাখ্যা হবে নূতন রংয়ে, নূতন ঢংয়ে এবং আরো কত শত বক্তা কল্পনার জোরে কত কী বলবেন কে জানে!

কিন্তু আসল বক্তব্য এখনো বলা হয় নি। সেটা আমার।

অতীশ সেন আর যে কেউ-ই হন তিনি হচ্ছেন দূর সম্পর্কের আমার এক সেজমামা।

আমার কথা যদি বিশ্বাস করেন তা হলে' বলি—দেশকে তিনি সত্যই খুব ভালোবাসতেন কী না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বন্যার চাঁদা উঠলে কতখানি বন্যায় যেতো আর কতখানি উঠতো তাঁর পকেটে সে খবর আপনাদের চেয়ে যে আমি ভালো জানি এটুকু দয়া করে' স্বীকার করবেন। আর এও হলপ করে' বলতে পারি যে আমার মামাবাবুটী আর যা-ই হন, একটী আধলা তাঁর হাত দিয়ে সহজে কোনোদিন গলতে দেখেছি বলে' মনে নেই। আর পরের জন্য ভিটে-মাটী বিক্রীর কথা যদি বলেন তা হলে' বলবো এমন বেকুব তাঁর বংশে হয় তো কেউ-ই ছিল না যে এ কল্পনা মনেও স্থান দিতে পেরেছে। শুধু তাই নয়,

আজো গিয়ে দেখুন ন্যাশান্যাল ব্যাংকে তাঁর টাকার অংকটা কী রকম কানায় কানায় ছাপিয়ে উঠেছে। অবশ্য খাতা তাঁর নামে নেই, বিপদ এড়াবার জন্য আছে তাঁর পত্নীর নামে। তাঁর ইন্‌সুরেন্সের বহরটাও দেখে আসুন গিয়ে। এখনো প্রমাণ করে' দিতে পারি কতো টাকা তিনি মেরেছেন বিধবা আর পাওনাদারদের ফতুর করে'।

তবে কী বলতে চান—তাঁর কিছুই গুণ ছিলো না? হ্যাঁ, ছিলো অল্পবিস্তর বৈকি! তবুও সত্যের তলানিটুকু নিয়ে মানুষ কতো বড় যে একটা মিথ্যার বিরাট দুর্গ গড়ে' তুলতে পারে এ যেন দেখলাম তারি একটা উৎকট প্রতিযোগীতা!

আর শুধু তাই নয়, আরো ভাবলাম, না জানি পৃথিবীর বড়ো কবিও যদি কোনোদিন পঞ্চভূতের দাবী মেটাতে গিয়ে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, তা হলে' হয় তো এও শুন্‌তে হবে যে তিনি একটা বিরাট দাতা ছিলেন বা এমন একটা কিছু ছিলেন যা জীবিত কালে তাঁর জীবনীতে কোনোদিন পড়েছি বলে' মনে হয় না।

১৪—৭—৪০

কুড়ি টাকার পরিণতি

হাজার নয়, দু' হাজারও নয়।

এমন কী দু'শো বা একশোও নয়।

মাত্র কুড়িটি টাকা। এই কুড়ি টাকা জমিয়েছিলাম 'পুতপুত' করে', ছ' মাসের উপার্জন থেকে। এ মাসে তিন টাকা, পরের মাসে দু' টাকা, তার পরের মাসে চার টাকা এইভাবে। বাড়ীতে সেটা জান্‌ত না। জান্‌লে আমি ঠিক জানি—এ টাকা জম্‌তো না। কারণ, এত অভাব-অভিযোগে আট আনা পয়সাও জমে না। কিন্তু সে কথা যাক্‌। টাকাটা যখন জমেছে, তখন নিশ্চয় এটার খরচের পিছনে একটা উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু সে উদ্দেশ্যটা কী?

সেইটাই ভাবতে লাগলাম।......

বন্ধুবর নন্দবাবু বল্‌লেন—এক কাজ করুন। আসুন, আপনাতে আমাতে একটা বই ছাপাই। সস্তায় ছাপাবার আমার জানাশোনা প্রেস আছে। আপনি কুড়ি টাকা আর আমি কুড়ি টাকা দিলেই উপস্থিত বেশ একখানি গল্পের বই ছাপানো যাবে।

প্রিয় বন্ধু সুনির্মল বল্‌লে—এক কাজ করা যাক্‌। আয়, তো'তে আমাতে কতকগুলো ইংরাজী 'এন্‌থোলজি' কিনি। সেগুলো পড়ে' বেশ চুরি লাগানো যাবে।

অফিসের সহকর্মী গোস্বামী বল্‌লেন—চলো সুদর্শন, পূজোয় পুরী ঘুরে আসা যাক্‌। গোটা কুড়ি টাকা হ'লেই একজনের চল্‌বে।

পাড়ার ডাক্তার মোটা মল্লিক বল্‌লেন—শরীরটা শুধরে নাও। পেটের অসুখে তো ভুগছো। এসো ইন্‌জেক্‌সান লাগাই। বেশী খরচ পড়বে না। ধরো, আঠারো-উনিশ টাকাতেই বেশ তাংড়া হয়ে' উঠবে।

কুড়ি টাকার পরিণতি

এক ফিল্ম-আর্টিস্ট বললেন—তুমি যদি কুড়ি-বাইশ টাকা ঘুস দিতে পারো, তা' হ'লে তোমায় আমাদের ছবিতে নামিয়ে দিতে পারি। একটা ভীড়ে-টিড়ে বেশ 'প্লে' করে' আসবে—অথচ, কেমন 'ফেমাস' হয়ে' যাবে!

বৌদির বোন এসেছিলো বাড়ীতে। অপূর্ব সুন্দরী আর স্বাস্থ্যবতী। একদিন সে গোপনে বললে—চলো, তোমাতে-আমাতে বাইস্কোপ দেখে আসি। আর কাউকে সংগে যেতে দেবো না কিন্তু. তারপর বাইস্কোপ দেখে-টেখে বেড়াবো চতুর্দিকে; সত্যি, তোমায় আমার খুব ভালো লাগে। কিন্তু ভাবছো কী? কাছে পয়সা নেই?

কী করে' আর পোড়ামুখে বলি—পয়সা নেই। কেন থাকবে না? আছে তো কুড়ি টাকা। কিন্তু এই টাকাটাকে কেন্দ্র করে' যে বিধাতার এত ষড়যন্ত্র চল্‌বে তা কে জান্‌তো! প্রস্তাবটা খুবই লোভনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু কী জানি কেন এই কুড়ি টাকা খরচ করতে কেমন যেন মন চাইলো না। মনে হ'ল—ভবিষ্যতে বোধ হয় এগুলোর চেয়েও কোন বড় দরকার দেখতে পাবো সাম্‌নে, যখন কুড়ি টাকার সত্যই সদ্ব্যবহার হবে।

বললাম—আজ থাক্ মিনতি। শরীরটা ভাল নেই। বলে'ই কেটে পড়লাম।

ভেবে দেখলাম—নন্দ, সুনির্মল, গোস্বামী, মোটা মল্লিক এবং ফিল্ম-আর্টিস্টের প্রস্তাবগুলো.। কিন্তু প্রত্যেকের প্রস্তাবগুলো মনে বেশ লাগলেও কী জানি টপ করে' এই কুড়ি টাকা বার করলাম না। জ্ঞানীরা বলেছেন সবুরে মেওয়া ফলে। কাজেই, সমস্ত লোভ

আপাততঃ চেপে রেখে জ্ঞানীদের এই কথাটা পালন কর্‌বার জন্যই তৈরী হলাম।

তারপর প্রায় দু' মাস বসেছিলাম।

আবার কলম ধরতে হ'ল টাকাটার পরিণতির কথা জানাবার জন্য। হ্যাঁ, টাকাটা কিসে খরচ হ'ল, সে কথাই বল্‌ছি।

পূর্বোক্ত কোন প্রস্তাবের সাফল্যে সে টাকা বার হয় নি। আন্‌ছিলাম অপরের গোটা পঁচিশ টাকা এক ভদ্রলোকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য। তাঁর কাছে এসে স্তম্ভিত হয়ে' দাঁড়ালাম। দেখি, পকেটের ভিতর হাত দিলে তা' অবাধে পকেট ভেদ করে' বেরিয়ে যায়—অর্থাৎ, কোনো দক্ষ পকেটমার শিল্পী সে টাকাগুলি আত্মসাৎ বা উপার্জন করেছে আমার পকেটটা কেটে।

আমি গুণগার দিলাম বহুদিনের পরিশ্রমে জমানো আমার সেই কুড়িটা টাকা। আরও পাঁচটা টাকা দিলাম অপরের কাছ থেকে ধার করে'।

৩১—৮—৪০

আর মাত্র দশ মিনিট বাকী।

এই দশ মিনিট-ই খোলা থাকবে লাইব্রেরী। এর পর-ই হবে সাড়ে আটটা। আর, লাইব্রেরীও বন্ধ করে' চলে' যাবেন লাইব্রেরীয়ান। শীতের রাত। সাড়ে আটটা কী কম?

মাত্র দশ মিনিট! তা হক'। প্রভাত ঢুকেই একদমে বলে' গেল দু'চারখানা বইয়ের নাম।—আছে না কী?

—নেই! সদাশিব লাইব্রেরীয়ান মাত্র একটা ছোট কথাতেই সেরে দিলেন।

—তা হলে' এগুলো বেরিয়ে গেছে বলছেন? প্রভাতের মুখে বিরক্তির ছায়া।

—হ্যাঁ। লাইব্রেরীয়ান হাঁ করে' মুখ বুজ্‌লেন।

তা হলে' মুস্কীল তো! প্রভাত একবার ঘড়ির দিকে চাইলে। সত্য-ই!···ও ভাবলে—মনে মনে দু' একটা বই মনোনীত করে' আসার পর যদি না পাওয়া যায় তা হলে' তো দুঃখ হয়-ই। বিশেষ করে' আজকের রাত্রিটা বাদে কাল-পরশু দু'দিন-ই ছুটি। এই দু'দিন ছুটি—যদি না একটা ভালো বইয়ের সংসর্গে কাটানো যায় তা হলে' আর কী হল' লাইব্রেরীতে এসে! দূর্ ছাই! প্রভাত দমে' গিয়েও সাহস সংগ্রহ করে' নিলে আর সহসা বীরের মতো গুটিয়ে নিলে হাতের আস্তীন। এখন তাকে যে কোনো প্রকারে এই বইয়ের অরণ্য থেকে একখানা ভালো বই জোগাড় করতেই হবে। নাই বা পেলে সে তার নির্দিষ্ট বই। তার চেয়েও হয় তো একখানা ভালো বই পাবে।···সামনে ছিল পুস্তকের তালিকা। প্রভাত সেটাকে গ্রাহ্য করলো না। এক পাশে সরিয়ে,

চলে' গেল ভিতরে। আর, বইয়ের অন্ধকার অরণ্যে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো।

আশ্চর্য ! এ সব বই-ই তো তার পড়া ! সব বাংলা বই সে এক ধার থেকেই তো শেষ করে' দিয়েছে ! হ্যাঁ - করেনি মাত্র কতকগুলো মেয়েদের লেখা বই। এই যেমন প্রভাবতী, অনুরূপা, আশালতা—এঁদের। কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে, প্রভাতের ধারণা না কী মেয়েরা কিছুই লিখতে পারেন না। হয় তো এক ঘণ্টা পরেই এ ধারণা বদলে যেতে পারে যদি ইতিমধ্যে পড়ে' ফেলা যায় একটা মেয়েদের লেখা বই কিন্তু কেন যে সাধ করে' এ পথ সে কখনোই ধরবে না !—কিন্তু পড়বার মতো বই টপ করে' পাওয়া যায় কোথা ? ধরো, শরৎ চাটুয্যের নভেল। —এ তো এখন শিক্ষানবিশ পড়ুয়ারা পড়বে। ধরো, প্রভাত মুখুয্যের গল্প। এ তো কোন্ কালে পড়া হয়ে' গেছে প্রভাতের। আরো নূতন বই— হ্যাঁ, আরো নূতন বইগুলোই বা গেল কোথা ? এই যেমন 'বন্ধু-প্রিয়া', 'ঘুম ভাংগার রাত', 'রোমান্স' বা আরো পাট ভাংয়া হয়নি যার—অর্থাৎ সদ্য বেরিয়েছে বাজার থেকে মাত্র মাসখানেক আগে, সেই বইগুলোই বা পাওয়া যায় না কেন ? ও ! সে তো এখন যাবে না ! প্রভাত বুঝতে পারলে, ওগুলো প্রথমে এসেই কাদের কাদের খপ্পরে যায়। অর্থাৎ প্রথমে পড়ে লাইব্রেরীর যিনি হত্তাকর্তা গোছের— তাঁর হাতে, তারপর লাইব্রেরীয়ানের কাছে থাকে সপ্তাহ খানেক, তারপর থাকে তাঁর আলাপী আত্মীয়-বন্ধু বা লাইব্রেরীর যিনি একটু···ইয়ে···তাঁর কাছে ! তারপর দু'মাস আগের কেনা বইখানা হঠাৎ একদিন আত্ম-প্রকাশ করে পুরাতনের অবস্থা নিয়ে পাঠকদের জনতার সামনে। কাজেই, এমন গুণের লাইব্রেরীতে অমন

নূতন বইয়ের আশা করা উপস্থিত বৃথা।

প্রভাত একটা তাক থেকে দু'খানা বই বার করে' নিলে। তার একটা খুলেই একখানা পাতার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে' গেল। বই-খানার নাম হচ্ছে—"বিবাহের চেয়ে বড়ো"—অচিন্ত্য সেনগুপ্তের। একটা পাতার উপরের দিকে দু' লাইন লেখা আছে—"প্রেমের ব্যাপারে কবিরা চাঁদকে কেন যে এত আস্কারা দিয়েছেন বলা কঠিন। অন্ধকারে কতো সুবিধে।" ···আর আশ্চর্য, এই দুই লাইনকে নিয়ে কতো লোক যে পেন্সিল আর কালিতে মন্তব্য করেছেন বইয়ে, তা না গুণলে টপ করে' বলা কঠিন।

এক ভদ্রলোক লিখেছেন, ঠিক-ই তো! অন্ধকার না হ'লে জমবে কেন?···

তার তলায় আর এক হাতের লেখা: বাঁদ্‌রামী করবার জায়গা পাও নি?···নিজের পয়সায় বই কিনে এনে ওসব লিখবে। ফের যদি দেখি ভালো হবে না বলে' দিচ্ছি।

···তার তলায় কালি দিয়ে লিখেছে অপর একজন: ভালো হবে না তো কী করবে শুনি?...লিখবো···একশো বার লিখবো···আল্‌বাৎ লিখবো।

প্রভাত বিরক্ত হয়ে' বইখানা মুড়ে ফেল্লে। এখন আর ক' মিনিট আছে? ঘড়ির দিকে চেয়েই ও কেঁপে উঠলো।···মাত্র পাঁচ মিনিট। এই পাঁচ মিনিটের ভিতর সে কী বই-ই বা বেছে নেবে? কিন্তু কেন পারবে না। একটা ভালো বই হাতে উঠলেই তো হ'য়ে গেল। আচ্ছা, যদি ছ'মাসের বাঁধানো ভারতবর্ষ বা বসুমতী বা প্রবাসীটা নেওয়া যায়···কিন্তু না। এগুলোর ভিতর যথেষ্ট ছোট-গল্প বা ছবি-প্রবন্ধ

থাকলেও দু'দিন ছুটি কাটাবার উপযোগী জিনিস এ নয়। তার চেয়ে মিলে যায় যদি একটা 'অভিজ্ঞানের' মতো বেশ মোটা-সোটা উপন্যাস বা 'অগ্রগামীর' মতো একটা মিষ্টি বড় গল্পের বই তা হলে' আর চাই কী ? ফস্ করে' প্রভাত আর একটা বই টান্‌লো তাক থেকে ; আর সেটা খুলে প্রথম পাতাটা পড়ে'ই হতাশ হল'। নেহাৎ পল্লীগ্রামের চিত্র।...একটী গ্রাম্য পানা-পুকুরে জল নিতে এসেছে একটী চাষার মেয়ে। দুঃখেও হাসি পেল তার ! আচ্ছা, সহরের এত বড় বড় চমৎকার বিষয় থাকতে ওই সমস্ত কেন, ওঁরা কী সহরে বাস করেন না ? কিন্তু কী জানি কেন—তাঁরা গ্রামকে ছাড়লেও গ্রাম তো তাঁদেরকে ছাড়ে না !

অথচ একথা বল্লেই ওঁরা বলবেন—বাংলা দেশ কোন্‌টাকে বোঝায় ? দেশের শতকরা নিরানব্বই জন-ই তো গ্রামের লোক। ঠিক কথা। কিন্তু গ্রামের সব কিছুই বজায় আছে কী না ! ফুঃ ! কাজেই সাহিত্যে গ্রাম ছাড়া আর কী আনবেন ? কেন, গ্রাম নিয়ে কম লেখা হয়েছে ? বংকিম চন্দ্র থেকে শুরু করে' ও তোমার রবীন্দ্র ঠাকুর, শরৎ চাটুয্যে, বিভূতি বাঁড়ুয্যে, নারায়ণ ভট্টাচার্য, কতো মহারথীর নাম আর মনে রাখা যায় ? তার পরও গ্রাম ! আর হ্যাঁ, প্রবাসী !—এটী এত বড পত্রিকা হলে' কী হবে পল্লীগ্রামের গল্পের যেন এ একমাত্র মুখপাত্র। না, না চলবে না...চলবে না। এর চেয়ে যে কোনো একটি অতি-আধুনিক পত্রিকা, ধরো, পরিচয়, চতুরংগ, কবিতা—সবগুলোই তো ভালো কাগজ।

—আচ্ছা কবিতা আছে ? ...বাঁধানো মাস ছয়েকের ? হঠাৎ প্রভাত লাইব্রেরীয়ানকে প্রশ্ন করলো।

—কবিতা ? কার কবিতা ? লাইব্রেরীয়ান জিজ্ঞাসা করলেন ফের প্রভাতকে।

—কী আশ্চর্য ! কবিতা পত্রিকা। নাম শোনেন নি ?

—আজ্ঞে না তো। লাইব্রেরীয়ান হাঁদার মতো জবাব দিলেন। আর, হাই তুলে বল্লেন—কবিতা-টবিতা আমরা রাখি না লাইব্রেরীতে। ·· কেউ পড়ে না···

—কেউ পড়ে না, কাজেই রাখেন না। বেশ কথা তো ! তা হলে' সংসংগমালা না-কী ওই নামের বইগুলো তো লাইব্রেরী থেকে সরিয়ে দিতে পারেন। যে হেতু কেউ পড়ে না !

—সে কথা আর অত ভেবে দেখছি কৈ ? লাইব্রেরীয়ান অল্পই বিচলিত হয়ে', দাঁড়িয়ে উঠলেন আর সামনের স্তূপীকৃত নভেলগুলো দু' হাত দিয়ে সরাতে লাগলেন।

প্রভাত অনেক কষ্টে এবার রাগটা দমন করে' নিলে আর মনে মনে ভাবলে এই না হলে' আর লাইব্রেরীয়ান। কেউ পড়ে না কাজেই আর রাখার দরকার নেই। যেন পাঠকদের মনস্তত্ত্ব এঁদের নখ-দর্পণে। শুধু তাই নয়, প্রভাত আরো আশ্চর্য হল' ভেবে যে এই শ্রেণীর ভোঁতা লোকগুলোকেই বা লোকে লাইব্রেরীয়ান বলে' মানে কী করে' ? অন্ধ দেশ হলে'...। যাক্ গে ! প্রভাত আবার বই খোঁজায় মনোযোগ দিলে। বইয়ের পর বই ঘেঁটে তার হাত প্রায় বেশ অপরিষ্কার হয়ে' উঠলো। আর হঠাৎ যখন ঘড়ির দিকে সে চাইলে তখন তার বসে' পড়বার মতো অবস্থা। হয় তো শীতকালেও একটু ঘাম বেরিয়েছে তার কপালে। আর, তার প্রাণ বোধ হয় বল্‌ছে চল এবার পালিয়ে যাই, যথেষ্ট খোঁজা হয়েছে ; আজকের মনের অবস্থা হয় তো তেমন

মোটেই আসে নি যখন কোনো বই-ই তার কাছে ভালো লাগবে।

কিন্তু তবুও সে হারতে রাজী নয়। হঠাৎ ইচ্ছা গেল বাংলা বই ছেড়ে সে এবার একখানা ইংরাজী বই বাছতে সুরু করবে। কেন, সাড়ে আটটা বাজলেই বা! ওদিকে লাইব্রেরীয়ানও দরজা বন্ধ করতে যাবেন আর এদিকে প্রভাতও ভালো একখানা বই খুঁজে পাবে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে বাংলা বই, মানে নিজের মাতৃভাষায়, একটা ভালো জিনিস পড়ে' যেমন আনন্দ পাওয়া যায় তেমন হাজার ভালো ইংরাজী পড়ে' পাওয়া যায় না। কিন্তু উপায়-ই বা কী? এতক্ষণ তো খোঁজা হল'! আচ্ছা, এক কাজ করা যাক্: প্রভাত চোখ বুজে ততক্ষণ ভাববে, বিদেশের নাম-করা বড় বড় কে কে সাহিত্যিক আছেন। তারপর-ই হঠাৎ চোখ খুলে তাঁর একখানা বই চাইবে। আর সেইটাই সে নিয়ে যাবে বাড়ীতে। এতে যা হবার হবে। দেখা যাক দুধের সাধ ঘোলে মেটে কী-না।

আচ্ছা—ওয়ান··টু···থ্রি! সে চোখ বুজেই ভাবতে লাগলো সব সাহিত্যিকদের নাম। নবীন-প্রবীণ কিছু বাদ নেই।···একধার থেকে যাঁর নাম মনে আসে। মনে আসতে লাগলো—ভিক্টোর হুগো···জোলা ···ডিকেন্স···আনাতোলি ফ্রান্স··মুট হ্যামসন্..বাল্‌জাক···শ···ডুমাস··· মেকলে···সাউদি···ইয়েট্‌স···গর্কী··· হ্যাগার্ড ··· কিপ্লিং ··· পার্লবাক··· ওয়েলস্···ওস্কার ওয়াইল্ড···লরেন্স···গলস্‌ওয়াদি··· টুর্গানিভ···হাক্সলি টি এস ইলিয়ট্‌···টলেস্টয়···আরো কতো কী। হঠাৎ সে চোখ খুলেই বলে' ফেললো, টলেস্টয়ের একখানা বই দিন তো আমায়···

লাইব্রেরীয়ান একপ্রকার দোর-তাড়া প্রায় বন্ধ করে' এনেছেন।

কারণ সাড়ে আটটা প্রায় পাঁচ মিনিট আগেই বেজে গেছে। তবুও কী করেন···এবার বিরক্ত হলেন, বল্লেন বাংলা বই-এ হ'লো না ?

প্রভাত বল্লে, না ·

এলো 'রি-সারেকসান"। আর বইখানা দেখে সত্যই প্রভাতের আর বই নিতে আজ ইচ্ছা কর্‌লো না। কোথাকার কতোদিনের উইয়ে-খাওয়া একখানা বই। পড়া তো দূরের কথা, হাতে নিতেই ঘেন্না করে। কী বিপদ! এইটাই নিয়ে যাবে বাড়ীতে ? আরে ছোঃ ! বসে' বসে' এ বই পড়ে' রস-আস্বাদন করার চেয়ে তো লাল-দীঘির ঘাটে বসে' মাছ-ধরা দেখাও ভালো। আর সংকল্পে তার কাজ নেই। এবার লাইব্রেরীয়ানের-ই শরণাপন্ন হওয়া যাক্। বরাতে অপমান-ই যখন আছে তখন তা থেকে মুক্তি নিয়ে তো সাময়িক লাভ নেই! এই ভোঁতা লোকটার কাছেই সে পরাজয় স্বীকার কর্‌লো, অন্ততঃ মনে মনে। বল্লে হঠাৎ মিনতি' করে' দেখুন এটা না হয় পরে পড়বো কিন্তু উপস্থিত কোনো একটা ভালো বই দিতে পারেন ? এই যেমন ছুটি কাটাবার উপযোগী—

লাইব্রেরীয়ান কথা শুনে সহসা যে বইখানা এগিয়ে দিলেন সেটা ভালো কী খারাপ সে-বিচার তো দূরের কথা, প্রভাত প্রথমে দেখে খানিকটা হাস্‌বে না কাঁদবে তা বাস্তবিক ঠিক করতে পার্‌লো না। অথচ লোকটা কী ভুল বশতঃ-ই এটা এগিয়ে দিচ্ছে, না কী ? খানিকটা দেখে দেখে প্রভাত বল্লে—বইটার নামটা কী দেখেছেন ?

লাইব্রেরীয়ান এতটুকু রহস্য কর্‌লেন না, বল্লেন, দেখেছি বৈ কী! নাম হচ্ছে, শুশ্রূষা (চিকিৎসার বই) - পড়ুন না, বুঝবেন কী জিনিস।

এবার সত্যই রেগে উঠলো প্রভাত। বল্লে' আর বুঝে দরকার

নেই। চমৎকার রুচি দেখছি আপনার। ওটা আপনার বন্ধু-বান্ধবদের পড়াবেন, যাতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কিছু জ্ঞান লাভ করে' তারা আপনার মস্তিষ্কের উপকার করতে পারে! এখন যা চাই আশা করি পাবো। এ সংখ্যার অবতার আছে? না, সেটাও কেউ নিয়ে গেছে?

লাইব্রেরীয়ান নিজের অবস্থার কথা ভুলে হঠাৎ হেসে উঠলেন। বল্লেন, এত বই ঘাঁটার পর অবতার? তা, ও আর নেবে কে? পাবেন বৈ কী···

—পাবো তো 'নশ্চয়! আজ না হয়, কাল তো পেতাম। প্রভাত এবার সোজা হয়ে' দাঁড়ালো, আর বল্লে, এতে হাসির কথা কী আছে? অবতার একটা যা তা কাগজ ভাবেন না কী আপনি?

প্রভাত নিজেও বুঝলো, একটা ভিত্তিহীন জিনিসের ভিত্তিটাকে কত ফাঁপালো করে' তুলেছে সে!

আর দেখা গেল, লাইব্রেরী যখন বন্ধ হয়ে' গেছে তখন সেই-ই একমাত্র প্রাণী যে অবতারটাকে দুমড়ে পাট করে' বগলে পুরে টলতে টলতে চলেছে আলো-ছায়ার মধ্য দিয়ে।

২৫—১২—৩৯

(১) মায়ের চিঠি

অনেক কষ্টে ত্রিনয়নী আজ নিতাইকে ধরতে পেরেছে। বাজারে সে তখন 'ডাংগুলী' খেলছিলো।—ত্রিনয়নীর সে কী মিনতি: আজ চিঠিখানা তোকে লিখে দিতে-ই হবে···তুই কেমন চমৎকার চিঠি লিখিস্···দে বাবা আজ দুপুরে এসে।

নিতাই তখন খেলায় মত্ত। চেঁচিয়ে উঠলো: তোমার রোজ চিঠি লেখা! কেন, গাঁয়ে তো কতো ছেলে রয়েছে; তাদের বল না লিখে দিতে···

ত্রিনয়নীও ছাড়বে না। মায়ের প্রাণ! বিপদ শুনে কেউ কী চুপ করে' থাকতে পারে! দুঃসংবাদ হাওয়ার আগে আসে—সেখানে নাকী কয়লার খাদ সব জ্ব'লে উঠেছে। এই তো, গাঁয়ের বীরেন চাটুয্যে সে দিন বলে' গেল তার জামাইয়ের মতো কে একজন নাকী মারা গেছে, আগুনে পুড়ে। মা গো! কী ভয়ংকর কথা! ভাবতেও ত্রিনয়নীর গা শিউরে ওঠে। তার উপর সে স্বপ্ন দেখেছে কাল রাত্রিতে যেন···কী ভীষণ স্বপ্ন! এখনো বাড়ীতে কাকগুলো কী ডাকটাই না ডাক্‌ছে! সন্ধ্যা বেলায় কুকুরগুলো কাঁদে! কর্তার অসুখ! হে ভগবান! না জানি কী ঘটেছে। ত্রিনয়নীর চোখে এতটুকু ঘুম নেই, মনে স্বস্তি নেই।

ত্রিনয়নী নিতাইকে আরো কাতর ভাবে অনুনয় কর্‌লে: বাবা, আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ, তাই তোকে বল্‌ছি···আমি কী নিজে লিখতে পারি? আর তুই ছাড়া আমার কে কথা শুন্‌বে বল্? তোর সেই মীনু-দিদির অনেকদিন খবর পাই নি রে...মনটা বড্ড খারাপ আছে।

নিতাইয়ের দয়া হলো। বল্লে, আচ্ছা, দুপুরে যাব এখন। তাই ত্রিনয়নী দুপুরে অপেক্ষা কর্‌ছিল। ঠিক এমনি সময়ে সত্য সত্য-ই

নিতাই এল'। নিতাইয়ের মনটা আজ ভয়ানক ভার ভার। ও-পাড়ার ঘেঁটু তাকে গুলি খেলায় হারিয়ে দিয়েছে। নিতাইও তাকে একচোট নেবে বলেছে। এখন চিঠিটা কোনো রকমে শেষ হ'য়ে গেলেই বাঁচা যায়।

নিতাই বলে' উঠলো: জ্যাটাইমা, তাড়াতাড়ি লিখবো কিন্তু; বেশীক্ষণ বসতে পারবো না, তা বলে' দিচ্চি। নিতাই ত্রিনয়নীকে জেঠাইমা বলে।

—না না, বেশীক্ষণ হবে কেন বাবা? ত্রিনয়নী আশ্বাস দিলে: এই তো আন্‌ছি চিঠি···লেখো না।

ত্রিনয়নী চিঠি আন্‌লে একটা ক্যাসবাক্স খুলে। বহুদিনকার লুকিয়ে রাখা, মিইয়ে যাওয়া একখানা পোষ্টকার্ড। নিতাইও কলমটা কালিতে ডুবিয়ে প্রস্তুত হল'।···এখন কথা পেলেই লিখবে সে।

ত্রিনয়নী অসুস্থ কর্তাকে ডেকে তুললো।—বলো, কী লেখা যায়? তোমার কিছু বলবার আছে কী?

কর্তার মুখে 'হুঁ'ও নেই 'হাঁ'ও নেই। তিনি যেন কেমন এক রকমের হয়ে' গেছেন। হাঁ ক'রে চেয়ে রইলেন···উদাস দৃষ্টি!

ত্রিনয়নী বল্‌তে লাগলো, লেখো বাবা···মা মীনু···

নিতাই লিখলো। ত্রিনয়নী যেন কথা ভেবে পায় না।—প্রতি পলে পলে এক দারুণ দুর্ভাবনায় যেন তার অন্তর শিউরে শিউরে উঠছে।

—আবার সে সংযত হ'য়ে বল্‌তে লাগলো: মা মীনু, তোর কী মা-বাবার জন্য এতটুকু মন কেমন করে না মা? তুই যে কেমন আছিস সে কী একদিনের জন্যও তোর জানাতে ইচ্ছা করে না?

আমরা আজ মাস পাঁচেক তোর চিঠি না পেয়ে যে কেমন আছি সে আর তুই কী জান্‌বি বল ? মেয়ের যদি বিয়ে দিস্ তা হলে' বুঝতে পার্‌বি আমাদের কতো যন্ত্রণা। মা মীনু, জামাই কেমন আছে তা তাড়াতাড়ি জানাবি। বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি রে! তোকে যে আমি···হঠাৎ ত্রিনয়নীর চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল বেরিয়ে গেল।

নিতাই এতক্ষণ ঘাড় হেঁট করে' লিখ্‌ছিল ; হঠাৎ সে কথা কয়ে' উঠলো।—এত আবল তাবল তাড়াতাড়ি বল্লে লিখি কেমন ক'রে ? সব গুলিয়ে গেল যে !—আমরা আজ মাস পাঁচেক···তারপর কী বল্লে ?

—তারপর ? ত্রিনয়নী চোখের জল মুছে বল্লে, তারপর···ভুলে গেলুম যে, হ্যাঁ, বড় ভাবিত আছি, লেখো।

মনে মনে নিতাই বিরক্ত হচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ মুখ তুল্‌তেই দেখে ত্রিনয়নীর চোখ দু'টো ছল ছল ক'চ্চে। তার মনে একটু দয়া হ'ল। হয় তো ছোট ছেলের হৃদয় দিয়ে সে জিনিসটাকে বুঝে ফেল্লে।

ত্রিনয়নী আবার বল্‌তে লাগলো : লেখো, তোমার বাবা বড় অসুখে পড়েছেন। এ যাত্রায় রক্ষা পাওয়া মুস্কীল। পয়সার বড় টানাটানি···চালে খড় নেই···মা মীনু! তুমি কী একদিনের জন্যও এখানে আস্‌বে না ?

আবার নিতাই লিখে যেতে লাগলো। শেষকালে হঠাৎ সে বলে' ফেল্লে, ব্যাস্, পোষ্টকার্ড শেষ হয়ে' গেছে।

—সে কী রে! ত্রিনয়নী যেন নিবে গেল।—এখনো অনেক কথা যে বলবার ছিল আমার।

—তা আর কী হবে বলো ? এটুকু কাগজে অত ধর্‌বে কেন ?

—আচ্ছা সবটা পড় দেখি।

নিতাই সবটা পড়লে। বুদ্ধি আছে ছেলের। জায়গায় জায়গায় নিজের কথা দিয়ে চিঠিখানা বেশ মানিয়ে দিয়েছে।

এতক্ষণে কর্তা কথা কইলেন। বল্লেন, বেশ হয়েছে বাবা·· বেঁচে থাকো।

নিতাই তড়াং ক'রে লাফিয়ে উঠলো : তা হলে' আমি যাই এখন।

—ওরে না না? ঠিকানাটা লিখে দে বাবা। নিতাইয়ের হাত ধরে' ত্রিনয়নী আবার বসালো।

নিতাই ঠিকানা লিখলে; তারপর আর দাঁড়ালো না—একেবারে চিঠি নিয়ে পোষ্ট অফিসে ছুট। আর ত্রিনয়নী মা-কালীর ছবির কাছে গিয়ে কেঁদে উঠলো : মাগো, মা, তাদের দু'জনকে বাঁচিয়ে রেখো মা, যেন কোনো বিপদ আপদ তাদের হয় না মা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মার প্রাণে যে কতো উদ্বেগ···

(২)

এধারে আর এক ছবি। বেলা প্রায় দশটা বাজে। মিঃ বিজন বিহারী সেন বাড়ী সাজিয়েছেন পরিপাটি করে'। কলকাতা থেকে আর্টিস্ট গেছে, রাঁধুনী গেছে। মিঃ সেন অকারণে ঝরিয়ার বাবুদের একটা বড় দরের পার্টি দিচ্চেন। শুধু তাই নয়, তাঁর পত্নী মীনা সেনকে যে-ভাবে সাজিয়েছেন তাতে রাণীর চেয়েও তাকে সুন্দরী দেখাচ্চে,—যদিও সে একজন পল্লীগ্রামের মেয়ে। মিঃ সেন উগ্র বিলাতীয়ানাকে দারুণ আয়ত্তে এনে ফেলেছেন।

বেলা এগারটার সময় ওখানকার কী একটা কলিয়ারীর ম্যানেজার মিঃ হ্যান্ডারসান এসে হাজির হলেন। মিঃ সেনকে দেখে কে? তড়াং করে' বাঘের মতো লাফিয়ে তিনি তাঁর মোটরের ধারে

গিয়ে হাজির। চোখ দু'টো তাঁর শিকারী কুকুরের মতো জ্বলে' উঠলো। হ্যাণ্ডসেক ক'রে নামালেন। আর ঠিক সেই সময়ে পিয়ন এসে তাঁর হাতে দিয়ে গেল একখানা চিঠি। নেহাৎ ছেলে মানুষের লেখা। মিঃ সেন গ্রাহ্য কর্‌লেন না। চিঠিখানা পকেটে পুরে সাহেবকে বিলাতী কায়দায় যতো প্রকার সেবা ছিল তার উদ্যোগ আরম্ভ কর্‌লেন। এধারে আধ ঘণ্টা পরে চিঠিখানা বেরুলো পকেট থেকে। মিঃ সেন এক চোখ টিপে দেখেন তাঁর স্ত্রীর নামে চিঠি। দিয়ে এলেন পত্নীকে।

মীনাকে আর বেশী দূর পড়তে হলো না। দু'লাইন পড়ে'ই তার কান্না। মা-বাপের দুঃখ সে বোঝে। বাড়ী ঘর দোর বেচে তার গরীব মা-বাপ কী কষ্টেই না এই বড়লোকের সংগে বিয়ে দিয়েছিলো। আর আজকে···। একধারে অকারণ অর্থব্যয় আর একধারে কী দারুণ দারিদ্র্য! চিঠি দেবার কী তার উপায় আছে? তার স্বামী যে প্রকারের লোক তাতে বাপের বাড়ীর সংগে এতটুকু সম্বন্ধ না রাখলেই তিনি বাঁচেন। কেন কে জানে, তিনি পছন্দ করেন না তাঁর সেই শ্বশুর বাড়ীর কোনো খবর; কোনো কথা। বলেন, তারা নাকী নেটিভ, নোংরা, মিন্‌-মাইনডেড্‌ ইত্যাদি ইত্যাদি। মীনা আবার চিঠিখানা পড়তে লাগলো আর চোখের জলে ঝাপসা হয়ে' এলো তার আজকের সমস্ত উৎসব, সমস্ত আড়ম্বর! মা-বাপের জন্য সে কী করেছে? কিছুই না। অথচ অপরাধী এই মেয়ে আর জামাইয়ের জন্য তারা ভেবে ভেবে খুন! মা···মাগো···মীনা কাতর-স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো।

হঠাৎ মিঃ সেন দারুণ লাফালাফি কর্‌তে কর্‌তে ছুটে এলেন ঘরে। মুখে তাঁর আনন্দবার্তা: শোনো শোনো মিস্‌ সনিয়েল

আস্‌ছেন, তোমাদের যাকে বলে বাংলায়, কুমারী মীরা স্যান্যাল। দেখবে এসো···দেখবে এসো···

কিন্তু মীনার দিকে চেয়েই তিনি থম্‌কে দাঁড়ালেন। মীনার চোখে তখনো জল—

কী হ'ল তোমার? তিনি গম্ভীরভাবে বল্লেন।

—চোখে একটা পোকা পড়েছে; মীনা বল্লে।

হঠাৎ গর্জন ক'রে উঠলেন মিঃ সেন।—Shut up ye dog. তোমায় যতো আদর দিচ্চি ততো তুমি মাথায় উঠ্‌ছো, নয়? পোকা পড়েছে? লায়ার কাঁহেকা! ও-সব নবেল-নাটুকে আইডিয়া এখানে চল্‌বে না, বুঝলে? মা তোমার কী লিখেছে? টাকা চেয়েছে বুঝি?

—টাকা কোনোদিন তোমার কাছে চেয়েছে মনে পড়ে? মীনা উতপ্ত হ'য়ে উঠলো। দেখতে পারো চিঠিখানা পড়ে' কী লেখা আছে এতে। মীনা চিঠিখানা ফেলে দিলে।

—আচ্ছা আমি দেখাচ্চি তোদের। মিঃ সেন রাগে কাঁপতে লাগলেন।—আমি সব বংশ শুদ্ধ তোমাদের পুলিসের ঘরে লক্ আপ্ ক'রে ছাড়ছি, দাঁড়াও। যা মুখে আসে তাই। মিঃ সেন নিমেষে চিঠিখানা উঠিয়ে নিয়ে টপ ক'রে একটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে দাউ দাউ ক'রে জ্বালিয়ে দিলেন। তারপরই পত্নীর দিকে ফিরে একটা তীব্র ঘৃণার কটাক্ষ হেনে জুতা দিয়ে পোড়া চিঠিটা মাড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

৫—৫—৩৮

চাঁদের দেশ।

আমাদের এই পৃথিবীতে যেমন আছে গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, বন-জংগল, আলো-অন্ধকার, তেমনি চাঁদের দেশেও ও-সব আছে। তবে সেখানে ভীড় নেই। ঝির্‌ঝিরে নদী বয়ে' যাচ্ছে, গাছের ডালে পাখী ডাক্‌ছে, লতায়-পাতায় শিশির ঝল্‌মল্‌ কচ্ছে। চতুর্দিকে ঝক্‌মক্‌ কচ্ছে আলো। কী সুন্দর আর কী চমৎকার এই চাঁদের দেশ!

এখানে একটি বনের মাঝে দু'টী প্রাণী বাস করে। একজন তরুণ, আর একজন তরুণী। দু'জন সর্বত্র একসংগে বেড়ায়, গান করে, হাসে, একসংগে ঘুমায়। তরুণীটী উর্বশীর চেয়েও রূপসী, আর তরুণ যেন সৌন্দর্যে কামদেব। তরুণীটী যখন গান গায়, তখন বনের পাখীও স্তব্ধ হয়ে' শোনে। আর তরুণ যখন বীণা বাজায়, তখন পাহাড়ও বুঝি প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠে। এ হেন তরুণ-তরুণীরও নাম আছে। নাম একটা থাকা ত চাই-ই। ধরো—তরুণের নাম রূপ, আর তরুণীর নাম রেখা। অবশ্য রূপ কারও নাম হয় কী না এ বিষয়ে সন্দেহ আছে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ধরো, হয়—কারণ, গল্পটা যখন চাঁদের দেশের, তখন একটু অস্বাভাবিকতা থাক্‌তেই পারে।

এখন তবে এক রাত্রের কথা বলি। সেদিন ছিল পূর্ণিমা। অবশ্য চাঁদের দেশে রোজই পূর্ণিমা হয়, কিন্তু কোনোদিন বেশী, কোনোদিন বা কম। সেদিন কিন্তু ভরা পূর্ণিমা। চতুর্দিকে রূপালী আলোর বান ডেকেছে। গাছের ছায়ায় ছায়ায় কে যেন মুক্তা ছড়িয়ে দিয়েছে। আর তারাদের যেন হাট বসেছে। রেখা রূপের কাছে শুয়েছিলে, হঠাৎ জেগে উঠল। তার মনে একটা চিন্তা এলো—আচ্ছা, এই সময়ে উদয় পাহাড়ে গেলে হয় না? হ্যাঁ, এই তো ঠিক লগ্ন।

এই দিগন্তভরা জ্যোৎস্না, এই রাত্রি—না, দেরী করা উচিত নয়—কারণ, সে শুনেছিলো ভরা-পূর্ণিমায় না কী ওই পাহাড়ের এক দেবতার কাছে গিয়ে বুকের রক্ত দিলে তার প্রিয়জনকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপহার দেওয়ার বর পাওয়া যায়। রেখাও মনে মনে কামনা করে তাই—কারণ, রূপের পায়ে সমস্ত দিয়েও যেন তার আশা মিটছে না, দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। প্রেমের ধর্মই এই। রেখা সবই দিয়েছে; দিয়েছে তার রূপ, তার যৌবন, তার দেহ। কিন্তু রেখার মনে হয়—এগুলো অতি তুচ্ছ। সমস্ত নারীই তো তার প্রিয়জনকে এই সব দিয়ে থাকে। এতে আর বাহাদুরী কী? না, এ দিয়ে সে সন্তুষ্ট নয়। সে দিতে চায় পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু, যা' কোনও দিন কোনো পত্নী তার স্বামীকে দিতে পারে নি।

সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে' ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। তারপর একবার চাইলো ঘুমন্ত রূপের দিকে। তারপরই হেসে রূপকে ছেড়ে চলে' এল'। এই তার প্রথম রূপকে না বলে' পালিয়ে যাওয়া, তাকে প্রবঞ্চনা করা। কিন্তু সে কী দেখে আনন্দিত হবে না, যখন জান্‌বে রেখা তার জন্য কী করেছে? আপন উদ্ভাবনায় রেখার শরীরে এক চঞ্চল ছন্দ নামলো, আর এক রোমাঞ্চ।···

রেখা চল্‌তে লাগলো বনের মধ্য দিয়ে। পায়ে পায়ে তার বেজে উঠলো শুক্‌না পাতার গান, উড়লো আঁচল, আর ছোঁয়া লাগলো ফুলের। তারপর ক্রমে সে এসে দাঁড়াল' সেই উদয় পাহাড়ে। গম্‌গম্ কচ্ছে পাহাড়, আর বিরাট দুর্গের মত তার সেই দুর্ভেদ্যতা। রেখা দেবতার পদতলে এসে হাঁটু গেড়ে বসলো। তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে প্রার্থনা করে' চল্‌লো। কিন্তু রক্ত না পেলে দেবতা খুসী হবেন না। কাজেই

এবার প্রার্থনা তার বুকের রক্ত দিয়ে।

সে খুব ধীরে ধীরে নিজের আঁচল খসিয়ে নিল', খুল্‌লো কাঁচলী, পরে তার দেহের সৌন্দর্য অবারিত করে' তুল্‌লো। তারপর সে তার স্তনযুগের উপর কর্‌লো প্রস্তরাঘাত। ঝরঝর ক'রে পড়তে লাগল রক্ত। তখন কোথা' থেকে বাতাসে কণ্ঠস্বর ভেসে এল'—কী চাও?

রেখা হাতযোড় করে' বল্লে—চাই পৃথিবীর মধ্যে যা' শ্রেষ্ঠ বর—সে আমার একমাত্র প্রিয়তমের জন্য।

উত্তর এল'—সেটা কী?

রেখা চোখ বুজলো। বল্লে—জানি না। কিন্তু যা' তার পক্ষে সব চেয়ে—সব চেয়ে বেশী মংগলের আর গৌরবের হবে, সেইটাই আমার একমাত্র কামনা।

উত্তর এল'—আচ্ছা, তথাস্তু—তাই সে পাবে!

রেখা তখন দাঁড়িয়ে উঠল। আনন্দে তার চোখ দিয়ে জল ঝর্‌ছে। সে কাঁচলী পর্‌লো, দেহে ওড়না চাপালো, তারপরই বনের মধ্য দিয়ে এক তীব্র পুলকের অনুভূতি নিয়ে ছুটলো নদীর দিকে। নিজেকে যেন সে আর ধরে' রাখতে পারছে না—এমনই এক উদগ্র আবেগ তাকে যেন হরিণীর মতো চঞ্চল করে' তুলেছে!···রেখা ছুটলো, আর ছুটলো।···

হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে আর পড়তে পড়তে এসে সে দাঁড়িয়ে পড়লো নদীর তীরে। কিন্তু এ কী! এই এত রাত্রে একটা নৌকা ভেসে যায় কেন? আর ওতে কে যেন বসে' আছে! রেখা নিজের চোখকে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লো না। হাত দিয়ে সে আড়াল করলো চাঁদের আলো। কিন্তু তবুও—

হ্যাঁ, নিঃসন্দেহ! নৌকা ভেসে যাচ্ছে তরতর ক'রে। অনেক—অনেক

দূরে। আর জ্যোৎস্নায় ফুটন্ত দুধের মতো নদী যেন উথলে উঠেছে। রেখা চীৎকার করে' ডাক্‌বে না কী? না, যে চলে' যায়, সে আর ফেরে না! রেখা যতই দেখে, ততই যেন অবাক্ হয়ে' যায়। আর কী আশ্চর্য —ওতে যে তার রূপেরই মতো কে একজন বসে' আছে! আর, আর একজন মনে হচ্ছে না—যেন একটা স্ত্রী-মূর্তি! কিন্তু ঠিক বোঝা যাচ্ছে কই?·· সে কী জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে?

অস্থির হয়ে' উঠলো সে।···

ঠিক্ সেই মুহূর্তে আবার কণ্ঠস্বর ভেসে এল'—কী দেখছো?

রেখা চীৎকার করে' উঠলো—আমি যে বুকের রক্ত দিয়ে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস এনেছি ওর পায়ে অঞ্জলি দেবার জন্য—কিন্তু ও যে আমায় ছেড়ে চলে' যাচ্ছে!···

তখন কে দূর থেকে বল্‌লে—তোমারই কামনা পূর্ণ করা হয়েছে—এই বরই তার লভ্য!

—কিন্তু—রেখা আবার চীৎকার কর্‌লো—সেটা কী?

উত্তর এল'—সেটা মুক্তি। একমাত্র মুক্তিই মানুষের পরম আশীর্বাদ। আর সেই মুক্তিই ওকে দেওয়া হয়েছে।

রেখা শুনে চোখ বুজলো।······

নৌকখানা তখন সেই চন্দ্রালোকিত নদীর বাঁকে অদৃশ্য হয়ে' গেল।

এবার শব্দ এল' সান্ত্বনার সুরে—তুমি এতে খুসী হয়েছ তো?

—হয়েছি। রেখা বল্লে।

আর সেই মুহূর্তে গভীর মূর্ছনায় একটা ঢেউ এসে তার পায়ে লুটিয়ে পড়লো।

৪—১০—৩৮

খুঁৎ

তার আসল নাম কিন্তু বল্‌বো না। ধরে' নিন—সত্যেন।

সত্যেনের সংগে একদিন ভাব হ'ল ধনেশ্বর শেঠের। ইয়া জাঁদ্‌রেল চেহারা! মুখে অনবরতই দু'-তিনটে পান। টাকায় যেন কুমীর। তিনি বল্‌লেন—তুমি লেখো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কী লেখো?

সত্যেন বল্‌লে—কবিতা।

—আরে রাম রাম, কবিতা অবার মানুষে লেখে! কবিতা লেখার দিন চলে' গেছে। তুমি লিখতে পারো গল্প?

—এ পর্যন্ত লিখি নি। সত্যেন বল্‌লে—তবে আপনার জন্য চেষ্টা করে' দেখবো।

ঘরে এসে গল্প লেখায় মন দিলে সত্যেন। আর সাধনা কর্‌লে মানুষের কী না হয়? সত্যেন লিখলে বেশ ভালো একটি গল্প। আর দেখালে গিয়ে ধনেশ্বরকে। তিনি বল্‌লেন—গল্প? তা', উপন্যাস লেখা শক্ত কিন্তু। উপন্যাস যদি লিখতে পার' তা হলে' জান্‌বো—হ্যাঁ!

উপন্যাসও লেখা হ'ল। মাস দুই ঘরে বসে' সত্যেন বেশ একটি উপন্যাস লেখা শেষ কর্‌লে। দু'-একজনকে দেখাতে তারা খুসী হ'ল। কিন্তু ধনেশ্বর বল্‌লেন—উপন্যাস লিখলেই তো চলবে না। এগুলো কাগজে ওঠে কী না দেখতে হবে। কাগজে বোধ হয় ছাপা হবে না।

কিন্তু কাগজেও ছাপা হল'। সত্যেন মনের আনন্দে নিয়ে গিয়ে ফেল্‌লে ধনেশ্বরের কাছে কাগজখানা। ওটা হচ্ছে অহিন্দুদের একখানি পত্রিকা। ধনেশ্বর কাগজটা কিন্তু ছুঁলেন-ই না। বল্‌লেন—থাক্, আর

দেখাতে হবে না। ও আবার একটা পত্রিকা—হেঃ! কেন, ভালো কাগজে কিছু লেখা উঠ্‌ল না?

—সে কী স্যার! সত্যেন বল্‌লে—পছন্দ হ'ল না? বেশ!

তারপর একটা হিন্দুর কাগজেই ছাপা হ'ল তার লেখা।

ধনেশ্বর বল্‌লেন—উন্নতি যদি কর্‌তে চাও তো 'বসুমতী'তে লেখো। 'বসুমতী' কিন্তু তোমার লেখা ছাপ্‌বে বলে' মনে হয় না।

না মনে হ'লেও 'বসুমতী' ছাপ্‌লো। সত্যেন গেল জয়ের আনন্দে। ধনেশ্বর বল্‌লেন—তা' আর এমন কী? 'বসুমতী' তো আজকাল লোকে পড়েই না। ও তো হচ্ছে মেয়েদের কাগজ।

সত্যেন কিন্তু দম্‌লো না। ধনেশ্বরকে খুসী দেখবার জন্য বল্লে—বেশ, পুরুষদের একটা কাগজের নাম করুন। না হয় চেষ্টা করি।

পুরুষদের কাগজের নাম করা হ'ল—'ভারতবর্ষ'। সত্যেন এবারেও গিয়ে ছাপালে একটা রচনা। কিন্তু তা'তেও খুঁৎ। খুসী নন্‌ ধনেশ্বর। বল্‌লেন—ইচ্ছা ছিল তোমায় পুরস্কার দেবো। কিন্তু দেখছি পুরস্কার তুমি চাও না। 'প্রবাসী'তে তোমার লেখা বেরিয়েছে এ পর্যন্ত?

—আজ্ঞে না। সত্যেন বিনয়ের সংগে বল্‌লে।

—তা' হ'লে দেখো, 'প্রবাসী'তে মাথা গলানো আর তোমার দ্বারা চল্‌লো না। ও বড় বিখ্যাত কাগজ কিন্তু।

—আজ্ঞে! সত্যেন চলে' এল'।

তারপর প্রায় মাস ছয় পরে দেখা গেল—'প্রবাসী'তেও সত্যেনের বেরিয়েছে একটা কবিতা।

এবার আর যায় কোথায়! সত্যেন গেল চাদর-টাদর গলায় দিয়ে ধনেশ্বরের কাছে। কিন্তু ধনেশ্বর তেমনি গোঁ-ভরে বল্‌লেন—না,

ও হ'ল না। ও তো কবিতা—এক টুক্‌রো দশ লাইনের! লেখো দেখি প্রবন্ধ।

প্রবন্ধও লিখলে সত্যেন। তবুও ধনেশ্বর নির্বিকার। বল্‌লেন—সব হয়ে'ও হ'ল না কিছু! তুমি সাহিত্যিক-ই নও। রবি ঠাকুরের আশীর্বাদ যোগাড় করতে পেরেছ?

এবার সত্যই বিচলিত হ'ল সত্যেন। দেখলে—লোকটা বড় তুখোড়। রাগে তার রগের শিরাগুলো ফুলে উঠলো। সে বল্‌লে—আশীর্বাদ যোগাড় কর্‌লে কী হবে শুনি?

ধনেশ্বর হাস্‌লেন। বল্‌লেন—খুসী হবো, আর তোমায় পুরস্কার দেবো।

কিন্তু এক শ্রেণীর শেয়ান-পাগল লোক আছেন, যাঁদের খুসী করা রীতিমতো শক্ত বই কী!

সত্যেন মরিয়া হয়ে' উঠলো। আর বল্লে, আপনাকে খুসী ক'রে আমার লাভ কী বল্‌তে পারেন? আর আপনার পুরস্কারেই বা আমার কী এসে যাবে? তবে আমায় আপনি পুরস্কার না দিলেও আপনাকে পুরস্কার দেওয়া আমার প্রয়োজন মনে করি।

বলে' সে বেরিয়ে এল' পা থেকে রবারের এক-পাটি জুতো খুলে ধনেশ্বরের মাথায় ছুঁড়ে দিয়ে।···

সে জুতা ধনেশ্বর কী করেছেন জানি না। তবে সত্যেনের বিষয় আর একটু বল্‌তে পারি। সত্যেন স্কয়ারে বসে' বসে' চুরুট টানে আর

ভাবে—আসলে ধনেশ্বরের-ই বা দোষ কী? তাঁকে একলা পেয়ে জুতো মারা হ'ল বটে কিন্তু খোঁজ করলে এমন লোক তো অসংখ্যই দেখতে পাওয়া যায় বাংলাদেশে, যাঁরা ওই ধনেশ্বরের মতোই আসল প্রতিভাকে কোনো দিনই দেন না আমল বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়ে যান তাঁদের নির্লজ্জতা আর নির্বুদ্ধিতা। তাঁরা কী সত্যই লেখকদের মংগলাকাংক্ষী? না, যে পারলো না 'ভারতবর্ষ' বা 'প্রবাসী'তে লিখতে, তাঁদের মতে তারা লেখকই নয়?

৭—৮—৪০

বোঝা

বড় দরের একটী একান্নবর্তী সংসার। সকলেই উপায় করে এখানে। সুকুমারও উপায় করতে সুরু করলে।…পঁয়ত্রিশ টাকা।

তার টাকা আর কাকারা হাতে করে' গ্রহণ করেন না। বলে' দিয়েছেন: এ থেকে শুধু কুড়ি টাকা তুমি বাজার করবে, দশ আনা করে' প্রত্যেকদিন বাজার করলেই চলবে, আর শোনো, চাকর-টাকরকে দিয়ে ওসব হবে না, নিজে বাজারে যাবে, স্বাবলম্বী হতে' শেখো।

সুকুমার রাজী হলো। আর স্বাবলম্বীও হলো। প্রত্যেক দিন নিজেই বাজারে যেতে লাগলো কিন্তু শাক তরিতরকারী কিনে মোটটী যা হয়ে' ওঠে তাতে ভদ্র লোকের ছেলের পক্ষে বয়ে' আনা একপ্রকার অসম্ভব। সুকুমার দেখে, বাড়ীতে সকলেই সকাল বেলাটায় মজায় থাকে আর তার প্রতি বেশ শাস্তি তো! কেন! সেও তো চাকরের উপর বাজারের ভারটী দিয়ে বেশ নিশ্চিন্তে কাকাদের মতো পড়তে পারে খবরের কাগজ আর বন্ধুদের ডেকে আড্ডা জমাতে পারে বৈঠকখানায়! কিন্তু না, কাকারা যে বলেছেন: স্বাবলম্বী হতে' শেখো!

আর স্বাবলম্বী হতে' শিখেও এ বাজারের বোঝা বহা কিন্তু সত্যই কষ্টকর।

সেদিন মা বললেন—সুকুমার, আর কাউকে করিস্ বা না করিস্ তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু মা লক্ষ্মীকে রোজ নমস্কার করবি বাবা, আরো মাইনে বাড়বে দেখবি।

সুকুমার বল্লে, দোহাই মা, তা যদি হয় তাহলে' আর আমি লক্ষ্মীকে নমস্কার কচ্ছি না। কারণ মাইনে বাড়লেই বিপদ! বাজারের বোঝাটী আরও সোজা হয়ে' কাঁধে চড়বে! এখন দশ আনার বাজার বইতেই

মারা যাচ্ছি, বলে প্রাণান্ত, তারপর কাকারা বলবেন বারো আনার করো, উঁহুঁ, নেড়া একবারই বেলতলায় যায়।

মা হাসতে লাগলেন। —সে কী রে! তা বলে' কী মাইনে বাড়বে না? ছিঃ ছিঃ! অমন কথা বলিস নি বাবা, লক্ষ্মী অপরাধ নেবে।

—তা নিক! সুকুমার বললে, বেকার থাকলেই আমার ভালো হত'। নইলে চাকর যাক, আমি পারবো না।

* * *

তারপর প্রায় দশ বছর কেটে গেল।

সুকুমার এখন আর বাজার যায় না। কিন্তু তার মাইনে কমে নি—বেড়ে গেছে। একেবারে পঁয়ত্রিশ টাকা থেকে একশো পঞ্চাশে এসে ঠেকেছে। কিন্তু বিপদ বা বোঝা বলে' জগতে যে বস্তুটী আছে সেটী কমেছে কী? আশ্চর্য!

সুকুমার একদিন ভাবলো: মাইনে বাড়লেই না কী বাজারের বোঝাও বাড়বে বলে' সে একদিন মার কাছে বলেছিলো বেকার থাকলেই ভালো হত'। কিন্তু আজ সে স্বপ্নেও সেকথা বলতে পারে কী? উপস্থিত আজ সে, যে-বোঝা বইছে তার কাছে বারো আনা পয়সার বোঝাটা কী খুব বেশী? চার আনার আলু পটল আর তাকে বইতে হয় না—ঠিক, কিন্তু যা সে বয় তার ওজন যে সিন্ধুবাদের দৈত্যের চেয়েও

চার গুণ। পরিবার! পরিবারকে বইতে হয়! দু'মণ মাংসের এক ছলধরা জীবন্ত মনসা! অনুষ্ঠানের ত্রুটী হবার জো নেই! ছেলের মাষ্টারের মাইনে, মেয়ের স্কুলের মাইনে, আর তার বাস-খরচা···ধোপা-নাপিত, ডাক্তার, যাওয়া-আসার খরচ, দু'টী বেকার আত্মীয়, দু'টী বিধবা বোন, তারপর তাদের আনুসংগিক নৈবেদ্য, ইত্যাদি ইত্যাদি এবং তা সত্ত্বেও বাইরের দেনা!

অধিক বলবো না, সাংসারিক লোক ক্ষেপে যাবেন!

আর সুকুমারের কথা আরো একটা বলতে বাকী আছে। ডালহাউসি স্কয়ারের একটা ডাষ্টবিনের ধারে পচা-মড়া এক খোট্টা সাধু বসে' যেখানে ধুনি জ্বালায় সুকুমার সেখানে গিয়ে বলে—বাবা! বোঝা কিসে কমবে তা বলে' দিতে পারো কী?

মূর্খ সাধু শুনে বোধ হয় হাসে!

১—১১—৩৮

শিল্পী

দেশে এক বৃদ্ধ চিত্রকর ছিলেন। তিনি এক সময় এক ছবি আঁক্‌লেন।—অবশ্য তরুণ চিত্রকরের অভাব ও দেশে ছিল না। তারা রংয়ের বাহার দিয়ে নানা ক্যারামতি করে' বৃদ্ধকে টেক্কা দিতে চাইলো। কিন্তু হলে' কী হবে, বৃদ্ধ যে ছবিটী আঁক্‌লেন তাতে মাত্র ছিল একটী রংয়ের সমাবেশ—লাল; আর সেই টক্‌টকে লাল রং দেখেই সকলে মজে' গেল। তারা আশ্চর্য হয়ে' চেয়ে বল্লে,—বাঃ, লাল রংয়ে যে এতো চমৎকার ছবি হতে' পারে তা তো আমরা জান্‌তাম না!

অন্যান্য শিল্পীরা ভীড় করে' বল্লে—কেন, আমাদের ছবি কোনো অংশে হীন হয়েছে? আমাদেরটা মনে না লাগবার কারণ কী?

কিন্তু মনে না লাগবার যে কী কারণ—তা আর লোকে বল্‌লে না; কারণ মনকে আবার বোঝা ও দায়!

অন্যান্য শিল্পীরা গায়ের জ্বালায় বৃদ্ধের দ্বারে গিয়ে হানা দিলে। প্রশ্ন কর্‌লে,—এ রং আপনি কোথায় পেলেন?···

কিন্তু বৃদ্ধ সদা হাস্যমুখ। হেসে বল্লেন—সে কথা বল্‌তে পারবো না।

আপনার সাধনায় আবার বৃদ্ধ মনঃসংযোগ কর্‌লেন।···তরুণ শিল্পীরা ক্ষেপে উঠলো।·· দেশ বিদেশ থেকে রং আনালো।—দামী দামী রং! ছবি আঁক্‌লো। কিন্তু কিছুদিন পরে ছবি নষ্ট হয়ে' গেল। প্রাচীন গ্রন্থ থেকে রং আবিষ্কার কর্‌লে; আবার আঁক্‌লো।···আবার খারাপ হয়ে' গেল।

এধারে বৃদ্ধ এঁকে যান। দিন-দিন তাঁর ছবি টক্‌টকে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে' ওঠে।···চাঁদের মতো পূর্ণ হয়ে' ওঠে সপ্ত কলায়। আর বৃদ্ধ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে' আস্‌তে থাকেন দেহে।

…অবশেষে হঠাৎ একদিন সকলে দেখলে—বৃদ্ধ মারা গেছেন, তাঁর ছবির সাম্‌নে।

তারা তাঁকে সমাধিস্থ কর্‌বার জন্য নিয়ে চল্‌লো। তারপর দু'তিন জন তাঁর ঘর খুঁজলো।—যদি কোনো নূতন রং বার হয়! কিন্তু এমন কোনো রং-ই পাওয়া গেল না, যা তাদের নেই!

তারপর যখন তারা তাঁকে নূতন কাপড় পরাবার জন্য দেহ থেকে উন্মোচন করলে জীর্ণ-বস্ত্র তখন দেখলে তাঁর বাঁ-পাশের বুকের মাঝে একটা ক্ষত। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এ রক্ত জুগিয়ে এসেছে; আর বুঝতে কারো বাকী রইলো না যে, এই বুকের রক্ত দিয়েই আঁকা হয়েছে তাঁর যা কিছু শিল্প! তারা তাঁকে সমাধিস্থ কর্‌লে। আর কর্‌লে অত্যন্ত দরিদ্রতার সংগেই। কারণ দেশ কখনো বোঝে না আপনা থেকে, শ্রেষ্ঠ-শিল্পীর প্রতিভা। মরে' গেলেও তাঁকে শান্তি দেয় না। যিনি দেশের জন্য সমস্ত করেন, দেশ শুধু 'নাই' পেয়ে পেয়ে তাঁর কাছ থেকে শুষে নিতে-ই জানে। শিল্পীর যে জীবন, শিল্পীর যে প্রাণ আজ দারুণ হতাশায় আত্মহত্যা কর্‌ছে—তা বুঝবে কে? তার জন্য পুরস্কার বুঝি স্বর্গেও নেই!

অবশ্য দু'একজন দরদী—দু'চার দিন তাঁর জন্য দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেল্লে। বল্লে, কী রং-ই না দেখিয়ে গেল!

কিন্তু এই দু'চার দিনেই শেষ!

এখন বহুদিন কেটে গেছে। তাঁর ছবি হয় তো বেঁচে আছে কিন্তু এই শিল্পীর জীবন-কথা আর কেউ জানে না। আর জেনেই বা লাভ কী? ততক্ষণ, খবরের কাগজে, কোথায় কী সার্কেস এসেছে বা প্রেমের কী ফিল্ম্‌ বেরিয়েছে তা দেখে লাভ আছে!…কী বলেন মশায়…?

১৪—২—৩৮

যঃ স্বভাবো হি যস্য স্যাৎ

সারা রাত্রি সৌদামিনী কাঁদলো, মাথা খুঁড়লো আর চেঁচালো। বল্‌লে—সারা জীবন তুমি আমার বৃথা করে' দিয়েছো! এমন জান্‌লে কে তোমাকে বিয়ে কর্‌তো? কেন আমার মা-বাপ আমায় জলে ডুবিয়ে মারে নি! এ কী কম কষ্ট!...কম রাগ! আমারি চোখের সাম্‌নে থেকে তুমি একটা 'ইয়ে'...কে নিয়ে মজা করবে। যা উপায় করবে, সেখানে দিয়ে আস্‌বে ঢেলে? তাকে নিয়ে যাবে গংগা-স্নান কর্‌তে? কেন, আমি কী কেউ নই—কেউ নই? সে-বার সে গেল হাসপাতাল আর দেখতে গেলে তুমি তাকে প্রত্যহ? কেন, এত লোক নিমতলায় যায় আর সে-মাগী মরে না? হে ভগবান! হে সূর্য-চন্দ্র! ইত্যাদি ইত্যাদি···

ইতিমধ্যে স্বামী বনমালী একবার কথা ও কয়ে'ছিল। বলে'ছিল—সে আমায় গুরুর মতো দেখে। কাজেই যাই, আর আমি তাকে দীক্ষাও দিয়েছি!

এ কথায় ফল ফল্‌লো কিন্তু বিপরীত।

সৌদামিনী উঠলো রাগে আরো লেলিহান হয়ে'। বল্‌লে—বেশ, তুমি তাকে মা বলে' ডাকতে পারবে কী না বলো শীগ্‌গির। যদি তাই হয় তাহলে' জান্‌বো, তুমি সাধু, নচেৎ কাল গিয়ে মাগীকে খেংরে মাগীর বিষ ঝেড়ে দেবো! ইয়ারকী···ন্যাকামী! পেঁচার হাড় খাইয়ে আমার ধনকে সে বশ করবে?

এর পর বনমালীও স্থির থাক্‌লো না। বল্‌লে—দেখো, রাত্রি হয়েছে, ঘুমুতে দাও, নইলে ভালো হবে না বল্‌ছি।

সৌদামিনী উঠলো গর্জ্জন করে'। বল্‌লে করবে কী শুনি? মারবে···মারবে আমায়? এখনি ডাক্‌বো না ওদের নেপেন বাবুকে?

ওদের গোপাল বাবুকে? বাইরে ফুর্তি করবে আর এখানে এসে চোখ রাংয়াবে?

কিন্তু বনমালী আর চোখ না রাংয়ালেও তার পরদিন যে কাণ্ডটা সৌদামিনী করে' বস্‌লো তা যেমন অভাবিত তেমনি বিস্ময়কর। যা বনমালীর বংশে কেউ করেনি, তার পত্নী সৌদামিনী শেষে তাই করলো। গেল স্বামীর অনুপস্থিতে সেই মেয়েছেলেটার মেটে-বাড়ীতে একটা চাকরকে সংগে করে' আর তুল্‌লো এক বিরাট কলরব।···স্বামী বাড়ীতে অনুপস্থিত থাক্‌লেও কিন্তু শিয়্যার বাড়ীতে উপস্থিত ছিলো কী রকম করে'।·· জুটলো এদিক ওদিক থেকে আরো পাঁচজনে। আর ঠুন্‌কো লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে সৌদামিনী তিরস্কার কর্‌লো মেয়েছেলেটাকে। অন্ততঃ সেই ঝি'টার চেয়ে সৌদামিনী নিশ্চয় মান-সম্ভ্রমে এবং সকল দিক হ'তেই বড়।···কাজেই দর্শকদল তারই পক্ষ নিলে। আর সৌদামিনী কাঁদ্‌লো, অনুযোগ কর্‌লো এবং সকলকে ব্‌লে—আপনারা দেখুন, এই রাক্ষসী আমার স্বামীকে পর করে' দিয়েছে! এই রাক্ষসী যদি বদ্‌মাইস না হয়, মেয়েছেলে যদি খারাপ না হয় তা হলে' পুরুষের সাধ্য কী এগুতে পারে?

অনেকেই এগিয়ে এলো সৌদামিনীর পক্ষ নিয়ে আর ঝি'টাকে প্রায় মারে মারে। ঝি'ও অনেক কিছু জানাতে চাইলো কিন্তু কেউ দিল' না তাকে কিছু বল্‌তে।···সকলেই বল্‌লে—তুমি খবরদার এই লোকটাকে ডাক্‌তে পার্‌বে না। আর বনমালীকেও সাবধান করে' দিল'।···যেন সে আর দ্বিতীয় দিন না এখানে আসে।···

ব্যাপারটা অতি সহজেই মিটলো; ঝিও ক্ষমা চাইলে, আর দু'চার

দিন পরে শোনা গেল ঝিটা নাকী তার বাসা উঠিয়ে নিয়ে দেশে চলে' গেছে !

অবশ্য সৌদামিনী যে এর পর সত্যনারায়ণকে সিন্নি দিল' মনের আনন্দে, এ কথা সত্য কিন্তু আরো কঠিন সত্য কথা শোনানো যে এখনো আপনাদের কাছে বাকী আছে সে কথাই বা না বলে' পারি কৈ ?

রক্তের স্বাদ পেয়েছে যে ব্যাঘ্র তাকে নিরামিষাশী করা শক্ত বৈকী !

দু' মাস পরে একদিন দেখা গেল—সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ফের ঢুকে গেল বনমালী এক খোলার বাড়ীতে !

সেখানে কুসুম নামে কে নাকী এক ঝি তার কাছে আবার দীক্ষা নিয়েছে !

কাজেই মেয়েমানুষ খারাপ, কী পুরুষ বদ্‌মাইস···সেটা নির্জনে ভেবে দেখবার বিষয় !

১—৮—৪০

টাইপিষ্ট

অফিসে এক টাইপিষ্টের পদ খালি ছিল। খবরটী কেমন করে' পেয়ে দু'জন ক্যান্‌ডিডেট্‌ এল পরীক্ষা দিতে। ছোটো সাহেব স্বয়ং বেরিয়ে এসে দেখতে লাগলেন তাদের কাজ। দু'জনের মধ্যে—একজন মোটা আর অপরটি রোগা। মোটাটী বস্‌তে না বস্‌তেই হাতের আস্তীন গুটীয়ে দিল ঝড় ছুটিয়ে।···একেবারে ষাট স্পীডে হাত চল্‌লো। আর রোগাটীর কী হল' কে জানে—প্রথম প্রথম বেশ সুরু কর্‌লেও শেষের দিকে এলিয়ে পড়লো।

কিন্তু অবাক হ'লাম ছোটো সাহেবের বিচার দেখে। যোগ্য হিসাবে চাকরী পাওয়া যার একান্ত উচিত সেই মোটাটী হল' না মনোনীত।··· পছন্দ কর্‌লেন ছোটো সাহেব রোগাটীকে। বল্‌লেন—মোটা থাক্‌বে না; ও কাজের লোক, অন্য জায়গায় পালাবে দু'দিন পরে। আর ল্যাদাড়ুই পার্‌বে টিকে থাক্‌তে। অতএব···

চমৎকৃত হ'লাম আর হ'লাম বিস্মিত! বিচার বটে!···

কিন্তু আরো বিস্মিত হওয়ার পালা যে ভাগ্যে আছে তা কে জান্‌তো?

দিন দুই পরে দেখি, সেই রোগা-মোটা দু'জনের ভিতর কেউ-ই পারে নি দখল কর্‌তে সেই শূন্য পদটী। করেছেন অপর একটী খেঁকুরে-মারা লোক; যার উচিত ছিল—এখনো এক বৎসর শিক্ষানবিস থাকা! আর বলা বাহুল্য—তার বড় পরিচয় হচ্চে—তিনি হেড্‌-টাইপিষ্ট বসন্ত বাবুর শালা! আর ছোটো সাহেব না কী বিশ্বাস করেছেন বসন্ত বাবুর মুখ থেকে শুনে যে—**He can fire away thousands of letters at a glance!**

১১—৩ ৪১

সমাপ্ত।